তৃতীয় অধ্যায়

দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যের আদর্শ

সমকালীন অন্যান্য অনেক কবির সঙ্গে তুলনায় দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতা ও গান সংখ্যায় অনেক কম - বরং নাটক লিখেছেন তিনি বেশী। তাঁর নাটক নিয়ে আলোচনাও হয়েছে অনেক। কবিতা ও গান নিয়ে বিচ্ছিন্নভাবে আলোচনা হলেও সামগ্রিক আলোচনা তেমন হয়নি। কিন্তু তাঁর কবিতা নিয়ে আলোচনার সার্থকতা আছে, একটি বিশেষ চিন্তাভঙ্গি ও স্টাইল তাঁর এই স্বল্প পরিমাণ রচনার মধ্যে দেখা যায়, যা তাঁকে অন্য কবিদের থেকে আলাদা করে চিনিয়ে দেয়। এছাড়া তাঁর নাটকগুলির মধ্যে যে গান আছে তাও আমাদের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করেছি -- নাটকে পরিস্থিতিগত মূল্য এছাড়াও গানগুলিতে কাব্যগুণ কতখানি আছে তা দেখার জন্য। কবিতাগুলির মধ্যেও অনেকগুলিই গান হিসেবে সুপরিচিত বিশেষ করে ব্যঙ্গাত্মক কবিতাগুলি।

এসমস্ত রচনার সঙ্গে স্বভাবতই দ্বিজেন্দ্রলালের মনোজীবনের সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ঠ। ব্যক্তি-গত জীবনের বিচিত্র ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে শুধু যে কবিতার বিষয়ে এসেছে বৈচিত্র্য তা নয়, স্টাইলেরও ঘটেছে পরিবর্তন। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ বালক কবির বিস্ময় ও স্বদেশ সম্পর্কিত ভাবনার পরিচয় আছে আর্য্যগাথা প্রথম ভাগের কবিতায়। অথচ আর্য্যগাথা দ্বিতীয় ভাগে সংকলিত হয়েছে রোমান্টিক প্রেম ও যৌবনসুখের কবিতা। এসময় পত্নী সুরবালা দেবীর প্রেমে কবিজীবন ছিল পরিপূর্ণ। বিলাত প্রবাসকালে পাশ্চাত্য প্রভাবে তিনি রচনা করেন ইংরেজি কাব্য 'The Lyrics of Ind' 'আষাঢ়ে', 'হাসির গান', 'মন্দ্র' লেখা হয় তখনই, যখন সুখস্বাচ্ছন্দ্যময় দাম্পত্যজীবনের সুধাস্নিগ্ধ ধারায় সমৃদ্ধ দ্বিজেন্দ্রজীবন।

আবার ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে নভেম্বর সুরবালা দেবীর মৃত্যুর আঘাতে কবি-মানসে ঘটে বিরাট পরিবর্তন। দৈনন্দিন জীবনের কাহিনী অবলম্বনে তিনি সে সময় লেখেন দুটি বিষাদের কাব্য - 'আলেখ্য' ও 'ত্রিবেণী'।

আসলে দ্বিজেন্দ্রলালের শিল্পী মন ছিল জীবনপ্রেমে ভরপুর, ইন্দ্রিয়ানুভূতি-নির্ভর। ধরা ছোঁয়ার বস্তুজগতে সংলগ্ন। চিন্তায় ভাবনায় প্রত্যক্ষ প্রমাণ ব্যতিরেকে কোনো কিছুকেই তিনি সত্য বলে মনে করতেন না। বাস্তবজীবনের এই সহজসরলতার প্রকাশেই তাঁর কাব্যের সার্থকতা। তাছাড়া ব্যক্তিজীবনে যে আধুনিক কালের যুক্তিবাদ ও বিচার-পরায়ণতাকে মর্যাদা দিয়েছিলেন সেইযুক্তি, বিচার ও কাব্যের মধ্যে গ্রথিত হয়েছে। কাব্যের এই বিষয়গত বৈচিত্রের দিক থেকে তাই তাঁর কবিতাগুলি প্রকৃতি, প্রেম, বিষাদ প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, যদিও তা ঠিক সুবিন্যস্ত নয়, এরা পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক। যেমন, বিষাদ-কবিতা লেখা হয়েছে গার্হস্থ্য-চিত্রের মাধ্যমে আবার প্রথমদিকে রচিত প্রকৃতিবিষয়ক কবিতায়ও আছে বিষাদের সুর। ব্যঙ্গমূলক কবিতার পেছনেও আছে দেশপ্রেমের প্রেরণা। জগৎ ও জীবন সম্পর্কিত ভাবনা লিপিবদ্ধ হয়েছে ব্যঙ্গাত্মক মনোভঙ্গির মধ্য দিয়ে। তবু যেহেতু দ্বিজেন্দ্রলালের চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে উপস্থাপনাভঙ্গিও হয়েছে রূপান্তরিত - দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ ও স্বাভাবিকতায়, সেহেতু আলোচনার সুবিধার জন্য বিষয়ের দিক থেকে কবিতাগুলিকে আমরা কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করে নিতে পারি।

১। প্রকৃতিবিষয়ক কবিতা - 'প্রকৃতিস্তোত্র' (আর্য্যগাথা প্রথমভাগ)

২। প্রেমবিষয়ক কবিতা - 'কুহু' (আর্য্যগাথা দ্বিতীয়ভাগ)

৩। বিষাদাত্মক কবিতা - 'বিষাদোচ্ছ্বাস' (আর্য্যগাথা প্রথম ভাগ)

৪। গার্হস্থ্যধর্মী কবিতা - 'আলেখ্য' ও 'ত্রিবেণী'

৫। দেশাত্মবোধক কবিতা - 'আর্য্যবীণা' (আর্য্যগাথা প্রথম ভাগ), 'THE STREAM' 'THE PSLAM OF LIFE ETC' (THE LYRICS OF IND).

৬। ব্যঙ্গমূলক কবিতা - 'হাসির গান', 'আষাঢ়ে' ও 'মন্দ্রে'র কিছু কিছু কবিতা - হিমালয়দর্শনে, নবদ্বীপ, তাজমহল প্রভৃতি।

কাব্যবিষয়ের এই বৈচিত্র্য ও আদর্শের স্বাতন্ত্র্যকে অনুধাবন করতে হলে পাশাপাশি তাঁর সমকালীন ও পূর্ববর্তী কবিদের আদর্শেরও পর্যালোচনা করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

প্রকৃতপক্ষে কাব্যসৃষ্টির পেছনে থাকে দুটি উদ্দেশ্য-এক শ্রেণীর কাব্যে কবিরা জগতের সৌন্দর্যকে অবিকৃতভাবে প্রকাশ করেন, আর এক শ্রেণীর কাব্যে প্রকৃতি বা বাস্তবকে 'আত্মচিত্তপ্রসূত উজ্জ্বল 'হৈমকিরণ' অর্থাৎ কল্পনার দ্বারা কবি সংশোধন করে নেন। অন্য-ভাবে বলা যায়, কবিরা এক শ্রেণীর রচনায় বাস্তবকে হুবহু অনুকরণ করেন। বস্তু বা বিষয়কে নির্ভর করেই এখানে কবিতা গড়ে ওঠে। তাই এই প্রথম শ্রেণীর কবিতাকে আমরা বলে থাকি বস্তুগত কবিতা। আর এক ধরণের কবিতা আছে তা হল, ভাবগত কবিতা - এখানে কবিরা বিষয়কে গুরুত্ব দেন না। কোনো একটি ঘটনাকে অবলম্বন করে ব্যক্তিগত ভাবনাকেই বড় করে তোলেন। বাস্তবজগৎ এখানে কল্পনার রঙে হয় রঞ্জিত। ফলে ইন্দ্রিয়-জগৎ থেকে মন এমন এক জগতে পৌঁছে যায়, দৃশ্যমান জগতের সঙ্গে তার সাদৃশ্য থাকে না, তবু তা সত্য জগৎ, অলীক নয়। সাহিত্যিক পরিভাষায় একে আমরা বলতে পারি ইন্দ্রিয়াতীত বা মনোজগৎ। ব্যঞ্জনাময়তাই এর প্রধান লক্ষ্য।

ঊনবিংশ শতাব্দীর কাব্যে এই বস্তুগত, ভাবগত কবিতার আদর্শই ছিল সর্বজনগ্রাহ্য। বস্তুনির্ভর কবিতার রীতি প্রতিষ্ঠা করেন কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। চারপাশে যা দেখেছেন তা-ই তিনি কবিতার বিষয়বস্তু করে নিয়েছিলেন। পরবর্তী প্রতিনিধিস্থানীয় কবিরা এই আদর্শ অনুসরণ করেই দেশাত্মবোধক বা জাতীয়তাবোধক কাব্যরচনায় ব্রতী হন। ভাবনার জালে জটিলতা সৃষ্টি নয়, একটি বস্তু বা ঘটনার আধারে সোজাসুজি বক্তব্য উপস্থাপিত করতে চাইতেন সেযুগের কবিরা, মহাকাব্যে থাকত পূর্ণাঙ্গ কাহিনী, বিস্তৃত বিষয় আর খণ্ডিত কাহিনী বা বিষয়ে স্ফুরিত হচ্ছিল গীতিকাব্যের লক্ষণ, হেমচন্দ্রের কবিতাবলী, নবীনচন্দ্রের অবকাশরঞ্জিনী' এই দ্বিতীয় ধারার অন্যতম উদাহরণ। মধুসূদনও ব্যক্তিগত জীবনের বেদনাকে ফুটিয়ে তুলেছেন বস্তুমূলক আখ্যান বা মহাকাব্যের মাধ্যমে। সেকালের জাতীয়-

ভাবনা এবং সমাজচেতনায় কবিদের ব্যক্তি-চিন্তা কাব্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ পায়নি। কেননা বাঙালী সে সময় সামাজিক, রাজনৈতিক, সাহিত্যিক ধর্মীয় প্রতিটি ক্ষেত্রেই গুরুতর পরিবর্তন ও বিপ্লবের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল। প্রাচীন দেশীয় আদর্শের প্রতি মমতা এবং তা রক্ষা করবার আগ্রহ যেমন তাঁদের মধ্যে প্রবল ছিল তেমনি বিদেশী শিক্ষার প্রভাবও ছিল অপরিসীম। সেজন্য বিদেশী ঐতিহাসিক আখ্যানকাব্যের আদর্শে স্বদেশপ্রেমমিশ্রিত কাব্যরচনার দিকেই সেকালের কবিদের প্রধানতঃ লক্ষ্য ছিল। প্রেম, প্রকৃতি যে তাতে একেবারে নেই তা নয়। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় তো 'প্রকৃতি' বিষয়ে বাংলাকাব্যের একটি নূতন দিক উদ্‌ঘাটিত করেন। তাঁর পূর্বে প্রকৃতির তেমন কোনো স্বতন্ত্র আসন ছিল না। নায়ক বা নায়িকার রূপও অন্তরের প্রতিক্রিয়া বর্ণনার জন্যই সে যুগের কবিরা কাব্যে প্রকৃতিকে আনতেন। মঙ্গলকাব্যে 'বারমাস্যা'র মধ্য দিয়ে নায়িকার সারা বৎসরের সুখদুঃখের বর্ণনা করা হোত। আবার বৈষ্ণব কবিরা রাধাকৃষ্ণের প্রেমকাহিনী বর্ণনার জন্য সৃষ্টি করতেন একটি প্রাকৃতিক পরিবেশ। রঙ্গলালই প্রথম কাব্যে রিচার্ডসনের 'কবি-চিন্তা-নিরপেক্ষ' প্রকৃতি বর্ণনার অবতারণা করেছিলেন -

" ধরাধর - অঙ্গে শোভে নানা তরুবর।
নয়নের প্রীতিকর ওষধি বিস্তর ।।
কোন স্থলে মৃদুস্বর করি নিরন্তর।
উগরে নির্ঝরচয়ে মুকুতা নিকর।।"

(সূচনা, পদ্মিনী উপাখ্যান)

তা সত্ত্বেও দেখা যায় এই সময়কার প্রকৃতিচিন্তা নিছক ব্যক্তি-ভাবনায় পর্যবসিত হয়নি। তার সঙ্গে যুক্ত দেশাচারের ভাবনানিবিড়তা এঁদের মূল লক্ষণ। আধুনিক গীতিকবিতা বলতে আমরা যে ভাবনির্ভর কবিতা বুঝে থাকি - যে কবিতা আত্মগত, যেখানে কবিরা তাঁদের নিজেদের ব্যক্তিগত আনন্দবেদনার অনুভূতিই বিশ্বজনীন করে তোলেন। সে শ্রেণীর কবিতা তখনো স্বতন্ত্রধারায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। মহাকাব্যের ধারাতেই তার প্রতিষ্ঠাভূমি রচিত

হয়ে একই সঙ্গে অনিবার্যবেগে বহমান ছিল। একে আমরা বলতে পারি কৃত্রিম ক্লাসিক ভাবাদর্শ বা বস্তুগত গীতিকবিতা। ইংরেজিতে বলে 'Pseude-classic' কবিতা। অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী, ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৫৬-১৮২৭), স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৭-১৯৩২) প্রমুখ কবির রচনায়ও এ ধরণের কবিতার স্বাদ অনুভূত হয়।

বিহারীলাল চক্রবর্তীর হাতেই ঘটে এই কৃত্রিম কাব্যরীতির মুক্তি। তিনিই প্রথম বাংলাকাব্যধারায় কবিতার জন্ম দেন, যেখানে কবিচিত্ত বাইরের জগৎকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে মানসজগতে নিমজ্জিত হল। এ প্রসঙ্গে একটি সুন্দর মন্তব্য আছে হরেন্দ্রমোহন দাসগুপ্তের লেখায় -

> "he wrote his verses under the stress of simple and fundamental emotions."[৭]

এই ভাবগত বা আধুনিক গীতিকবিতা মুখ্যতঃ আত্মভাবমূলক। মানবমনের একান্ত অনুভূতির বাহক। কবি এখানে ব্যক্তি-ভাবনাকে সার্বজনীন করে তোলেন। কার্যকারণ শৃংখলাকে অতিক্রম করে ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করেন এক নিগূঢ়তর ব্যঞ্জনা। অনির্দেশ্য সৌন্দর্য-লোকের উদ্দেশ্যে কবিমনের অভিসারও এই রোমান্টিক কবি ভাবনার একটি প্রধান লক্ষণ। ইংরেজি সাহিত্যে ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ওয়ার্ডওয়াথ ও কোলরীজ-এর যুগ্ম সম্পাদনায় 'Lyrical Ballads' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে রোমান্টিক কবিতার যুগ শুরু হয়। এর আগে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ থেকে মাঝামাঝি পর্যন্ত সময়ে পাশ্চাত্য দেশের কবিতাতেও প্রাধান্য পেয়েছিল ক্লাসিক-ধর্মিতা। একটি যুক্তি-বাদী মনোভঙ্গির ছাপ লক্ষ্য করা গেছে সেকালের রাজনৈতিক উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে। ভাষাও তাই এপর্বে কখনো হয়েছে তির্যক, কখনো শ্লেষ, কখনো বা সরলীকৃত উপস্থাপনায় পরিণত। গদ্যের প্রসার ঘটেছিল এসময় এবং গদ্যরচনা মূলতঃ হয়ে উঠেছিল জ্ঞানমার্গীয়। তথ্যের পরিবর্তে তত্ত্বের দিকে মানুষের মন নিবিষ্ট হয়েছিল। কিন্তু একটু গভীর ভাবে দেখলে দেখা যাবে গীতিকবিতার আভাস সে যুগের রচনাতেও মেলে। সেকালের বিখ্যাত কবি জন ড্রাইডেনের 'Song to a Fair', 'Young Lady', 'going out of the town' প্রভৃতি প্রেমের কবিতা এর অন্যতম উদাহরণ। তাঁর প্রায় সমকালীন কবি জন ডেনহ্যাম ('Coopers Hill' রচয়িতা), জন উইলমট,

আফ্রা বেন, চার্লস স্যাকভিল, জেম্‌স টমসন, এডওয়ার্ড ইয়ং Thomas Gray , রবার্ট বার্ণস, উইলয়ম কাউপার, নাট্যকার গোল্ডস্মিথ প্রমুখের নামও এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। এঁদের রচনায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে রোমান্টিক কবিতার পূর্বাভাস। কেননা টমসন নানা ঋতু নিয়ে 'The Season's (১৭৩০) নামে যে কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন, সেখানে গীতিকবির ভাবপ্রবণ মনের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। স্ত্রীর মৃত্যুতে এডয়ার্ড ইয়ং লিখেছিলেন যে, 'Nights thoughts on life Death and immorality' সেখানে মধ্যরাত্রির স্তব্ধ, কারখানার হীমশীতল প্রভৃতি যে বিষাদের ছবি আছে, সেই বিষাদানুভূতি রোমান্টিক কবিতারই প্রধান লক্ষণ। এই বিষাদের সুর আছে Thamas Gray'র 'The Progress of Polsy', 'The Bird,' 'The Descent of Odin' - প্রভৃতি কবিতায়। আবার গোল্ডস্মিথের 'The Deserted, Village' (১৭৭০)-এ যে nostalgia-র সুর শোনা যায় রোমান্টিক কবিতার জন্মকালে সেটাই ছিল মূল লক্ষণ। সাধারণ প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীকে, তুচ্ছ ঘটনাকে অসামান্য দরদ দিয়ে দেখার যে প্রবণতা ছিল গোল্ডস্মিথের, তারই পরিপূর্ণ রূপ দেখা যায় রোমান্টিক কবিতার জন্মদাতা ওয়ার্ডসওয়ার্থে। প্রকৃতি যে মানবমনের নিগূঢ় রহস্যের এক অমূল্য চাবিকাঠি, তা ইংরেজি সাহিত্যে ওয়ার্ডসওয়ার্থ এবং কোলরীজ প্রথম অনুভব করেন।

বাংলা সাহিত্যে বিহারীলালই দেখালেন এই নূতন কাব্যরীতি। মনের কথাকে মনের মতো বলতে পেরেছেন প্রথম তিনিই। 'সর্বদাই হু হু করে মন'। মনের হু হু করার এই অনাড়ম্বর প্রকাশ গীতিকবিতার পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। গীতিকবির আত্মতন্ময়তা ও ভাবনিমগ্নতাই তাঁর কবিপ্রকৃতির বিশেষত্ব। রোমান্টিক কল্পনার স্পর্শ দিয়ে তিনি বাস্তব সৌন্দর্যকে নিভৃত মানসলোকে বিচিত্রভাবে রূপায়িত করতে চেয়েছিলেন। প্রকৃতির জগৎই ছিল তাঁর নিজের জগৎ। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'বঙ্গসুন্দরী'তেই প্রথম প্রকাশ পায় বিহারীলালের এই নিজস্ব সুর। নারীর মহিমাকীর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির সাথে একাত্মতার উল্লাস ও বেদনা এবং শেষ পর্যন্ত সুপ্তাবিষ্টতার ছবিও আছে এতে।

'সারদামঙ্গলে'(১৮৭১) এই নিখিল সৌন্দর্যের চূড়ান্ত প্রকাশ। এর নামকরণে 'মঙ্গল' শব্দব্যবহারের ভিতর দিয়ে বাহ্যত প্রাচীন বাংলা কাব্যের রীতিই অনুসৃত। তবু সৌন্দর্যলক্ষ্মী সরস্বতীকে বিশ্বসৌন্দর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে কল্পনা করে যে বিস্ময়, রহস্যানুভূতি, হাহাকার, বেদনা বা নৈরাশ্যের পরিচয় দিয়েছেন বিহারীলাল, সেদিক থেকে অবশ্যই রোমান্টিকতার সাক্ষ্য বহন করে।

মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র যে গীতিকবিতা লিখেছিলেন সেখানে এই অধরা সৌন্দর্যের অনুসন্ধান-ব্যাকুলতা নেই, তাঁদের ছিল দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি - কল্যাণ ও মঙ্গলের আদর্শ লক্ষ্য করে সমগ্র বিশ্বের রূপবিবর্তন ঘটবে এবং অকল্যানের পরাজয় হবে। তা সত্ত্বেও এগুলি গীতিকবিতা। কারণ গীতিকবিতার অন্যতম লক্ষণ আত্মভাবপ্রাধান্য এবং অপ্রাপণীয়ের জন্যে হাহাকার বা মর্মবেদনার যথেষ্ট উদাহরণ রয়েছে এসব রচনায়। মধুসূদনের আত্ম-বিলাপের 'আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায় ' - এই হাহাকারই তো ভিন্ন রূপে ধ্বনিত হয়েছে বিহারীলালের রচনায়।

আধুনিক গীতিকবিতার একটি প্রধান বিষয় প্রেমকে কেন্দ্র করে মানবহৃদয়ের সূক্ষ্ম অনুভূতির প্রকাশ, বিহারীলালের বহু পূর্বেই সেই প্রেমসঙ্গীত আমরা শুনতে পেয়েছি। রামনিধি গুপ্তই এর প্রথম প্রবর্তক। রাধাকৃষ্ণলীলার ছদ্মবেশ না পরিয়ে সাধারণ নরনারীর মিলন বিরহের বিচিত্র হৃদয়ভাব অবলম্বনে যথার্থ গীতিকবিতা রচনার সূত্রপাত করেননি তিনি। নিজের দুঃখবেদনা ও অভিমানের রঙও মিশ্রিত হয়েছে সে সঙ্গে। সার্বজনীন নাহলেও এগুলি গীতিকবিতা। আধুনিক গীতিকবিতার সব লক্ষণ তাতে নেই বটে, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'গীতিকাব্য' প্রবন্ধে গীতিকবিতার যে সংজ্ঞা দিয়েছেন - 'বক্তার ভাবোচ্ছ্বাসের পরিস্ফুটতা মাত্র যাহার উদ্দেশ্য, সেই কাব্যই গীতিকাব্য।'[২] সেদিক থেকে এগুলি যে গীতিকাব্যের মর্যাদা লাভ করেছে এতে কোনো সন্দেহ নেই। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও এঁদের এবং নবীনচন্দ্রের 'অবকাশ-রঞ্জিনী'কে গীতি কবিতার উদাহরণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এদের আমরা বলতে পারি বস্তুনির্ভর গীতিকবিতা।

বিহারীলালের কাব্যেই সৃষ্টি হয় বাস্তবাতিরিক্ত কল্পনার উল্লাস ও প্রকৃতির প্রতি তীব্র আকর্ষণ। অব্যবহিত পরের কবি অক্ষয়কুমার বড়ালের 'প্রদীপ'(১৮৮৪), 'কনকাঞ্জলি'(১৮৮৫), 'ভুল'(১৮৮৭) প্রভৃতি কাব্যে এই উল্লাসের এবং দেবেন্দ্রনাথ সেনের কবিতায় এই আকর্ষণেরই পরিচয় পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথে এসে এই রোমান্টিক ও দার্শনিক কবি-ভাবনা হয় পরিপূর্ণ, তাঁর বিষয়-গৌরবহীন ভাবময়তায়। তিনি শেলীর মতো বিশ্বের অনু-পরমাণুতে ঐশীলীলা প্রত্যক্ষ করেছেন আবার কীট্স-এর মতো সৌন্দর্য উপাসনার আদর্শে নিজের কবিমনের সুর বেঁধে নিয়েছেন। কারণ গীতিকবিতা বা ভাবগত কবিতা বলতে তিনি কেবল ভাবোচ্ছ্বাসের পরিস্ফুটতাকেই যথার্থ মনে করেননি। কল্পনার অশরীরি সৌন্দর্য বা অতীন্দ্রিয়তারও প্রাধান্য দিয়েছেন। তাঁর মতে বস্তুময়তা এখানে একেবারেই মূল্যহীন।

তাঁর প্রথম দিকের বা কৈশোরক পর্বের রচনা কিন্তু অন্যরকম। এসময় শিক্ষায় নিযুক্ত ছিলেন তিনি, পূর্বসুরীদের অনুসরণে আখ্যান কাব্য বা গাথাকাব্য রচনারই চেষ্টা চলছিল তখন। 'পৃথ্বিরাজের পরাজয়'(লুপ্ত ১২৭১), 'বনফুল'(১৮০০), 'কবিকাহিনী' (১৮৭৮), 'ভগ্নহৃদয়'(১৮৮১) প্রভৃতি কাব্যসংগ্রহ এবং 'হিন্দুমেলার উপহার'(১৮৭৫) 'প্রলাপ'(১৮৮২ খ ৮০), 'দিল্লী দরবার'(১৮৭৭), 'অবসাদ' (১৮৭৮) কবিতা এর উদাহরণ। একটি কাহিনীকে আশ্রয় করে এই রচনাগুলির লিরিক সুর বেজে উঠেছে। 'বনফুল' কাব্যটি মূলতঃ কাহিনী ও চরিত্রনির্ভর। আট সর্গে বিভক্ত আদি-মধ্য-অন্ত সমন্বিত একটি নিটোল আখ্যানভাগ এই কাব্যে চোখে পড়ে। সেক্সপীয়রের 'টেম্পেস্ট', কালিদাসের 'শকুন্তলা' ও বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা'র কথা স্মরণ করিয়ে দেয় 'বনফুলে'র কাহিনী অংশ। গঠনের দিক থেকে আছে হেমচন্দ্র, অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী ও বিহারীলালের প্রভাব।

"চৌদিকে মানববাস নাহিক কোথায়,
নাহি জন কোলাহল গভীর বিজনস্থল
শান্তির ছায়ায় যেন নীরবে ঘুমায়!" ('দীপনির্বাণ', প্রথম সর্গ, বনফুল)

এর ছন্দোগত আদর্শ মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর। অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর 'উদাসিনী' কাব্যের ভাব, ভাষা, চিত্রকল্প এবং বিহারীলালের স্তবকগঠনরীতি, তিনমাত্রার ছন্দও একাব্যে অনুসৃত হয়েছে।

রস আমরা উপভোগ করতে পারি যেমন, 'বনফুলে'র প্রথম সর্গে পাই কমলার পিতার মৃত্যুতে শোকের উদ্যান, দ্বিতীয় সর্গে বিজয়ের আবির্ভাব, কমলার চৈতন্য সম্পাদন ও পিতার শেষকৃত্যের পর বিজয়ের কমলাকে বিবাহ করার ঘটনা বিবৃত হয়েছে। তৃতীয় সর্গের প্রথমাংশ-কে 'খাচার পাখির গান' নাম দিয়ে একটি আলাদা খন্ডকবিতা হিসেবে উপস্থিত করতে পারা যায়, আবার দ্বিতীয়াংশে আছে স্বয়ং সম্পূর্ণভাবে প্রথম প্রেমের বেদনা। এটিও আলাদাভাবে খন্ডকবিতার মর্যাদালাভের উপযোগী। 'কবিকাহিনী'র দ্বিতীয় সর্গে ধ্বনিত হয়েছে এক প্রেমানুরাগী বালার মর্মবেদনা - এও আপনাতে আপনি পূর্ণ। 'ভগ্নহৃদয়'-এর কবিতাগুলিও লিরিক হিসেবে উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথ নিজেই-এর ভূমিকায় বলেছেন -

> "এই কাব্যটিকে কেহ যেন নাটক মনে না করেন। নাটক ফুলের গাছ। তাহাতে ফুল ফুটে বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে মূল, কান্ড, শাখা, পত্র, এমনকি কাঁটাটি পর্যন্ত থাকা চাই। বর্তমান কাব্যটি ফুলের মালা, ইহাতে কেবল ফুলগুলিমাত্র সংগ্রহ করা হইয়াছে।" [৩]

অর্থাৎ এর কাহিনী ও চরিত্রলিপি কেবল বহিরঙ্গমাত্র, সেই বহিরঙ্গের আশ্রয়ে বা সূত্রে অন্তরঙ্গ গীতিকাব্যের রস পরিবেশন করাই একাব্যের উদ্দেশ্য। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে কাব্যটির চতুর্থ সর্গে কোনো কাহিনী নেই, আবেগ-নির্ভর আটটি গানের সমবায় মাত্র। এর কোনো কোনো অংশ রবীন্দ্রকাব্য ও সঙ্গীত সংগ্রহে স্থান পেয়েছে। আবার পদাবলী সাহিত্যের প্রভাবে যে 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' কাব্যগ্রন্থটি রচিত হয়েছিল সে কবিতাগুলির বিভিন্ন ছত্রেও রয়েছে গীতিকবিতার স্বাদ। এর ছন্দ সুরেলা, শব্দ সমাবেশে রয়েছে ব্যঞ্জনাধর্মিতা। 'অভিলাষ', 'প্রকৃতির খেদ', 'প্রলাপ' এসমস্ত খন্ডকবিতায়ও লিরিকের সুর শোনা যায়। দেশাত্মবোধক বিষয়কে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথ তাঁর অন্তরের আবেগ প্রকাশ করেছেন এখানে। তাঁর প্রথম দিকের রচনাগুলি তাই বিহারীলালের মতো কল্পনার রঙে রঞ্জিত হয়নি, বিশ্বের সঙ্গীতময় রূপের সঙ্গে তাঁর পরিচয়ের সূত্রপাত ঘটেছে। তিনি ভেবেছিলেন বটে - 'আমি নাবব মহাকাব্য সংরচনে' শেষ পর্যন্ত তা অসম্ভবই থেকে গেছে। বস্তুকাহিনী অবলম্বনে আত্মভাবই প্রাধান্য পেয়েছে রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিকের রচনায়। 'সন্ধ্যাসঙ্গীতে' এসে তিনি অনুভব করেন, বস্তুনির্ভর নয়, আত্ম

ভাবপ্রধান গীতিকবিতাই তাঁর প্রতিভার সুক্ষেত্র, কল্পনাশক্তির স্বাধীনবৃত্তির পরিচয় আছে এ সময়কার কাব্যে।

দ্বিজেন্দ্রলালের দৃষ্টিও ছিল আগাগোড়া বস্তুনির্ভর বর্ণনার দিকে। পূর্বসূরী ঈশ্বরগুপ্ত, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্রের মতো বস্তু বা বিষয়ের উদ্দেশ্যে ব্যক্তিহৃদয়ের আবেগ উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন তিনি। বক্তব্য যেমন ভাবালুতাবর্জিত, রচনারীতিতেও সহজ সরল পক্ষপাতি। মগ্নচারিতা, আবিষ্টতা ও বর্ণবিচিত্র কল্পনার পথে তাঁর কাব্যস্রোত কখনো প্রবাহিত হয়নি। বাস্তবকেই তিনি স্পন্দিত করেছেন কঠিন আবেগে, যেখানে নেই রোমান্সের কল্পনা। কাব্যজগৎ ও বাস্তবজগতের বিরোধ ঘোচাতে চেয়েছিলেন তিনি তাঁর সমস্ত রচনায়। একদিকে স্পষ্টতা এবং ঋজুতা অন্যদিকে অন্তর্মুখী দৃষ্টিভঙ্গি উভয় মিলে দ্বিজেন্দ্রকাব্যে সৃষ্টি হয়েছে এক নূতন আদর্শ। পূর্ববর্তী কবি হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, ঈশ্বরগুপ্ত প্রমুখের রচনায় বিষয় ছিল সাময়িকতাসর্বস্ব বা সামাজিক দৃষ্টিই সেখানে প্রধান। দ্বিজেন্দ্রকাব্যের স্পষ্টতা পূর্বসূরীদের রচনায়ও ছিল বটে কিন্তু সেখানে অভাব ছিল ব্যক্তিগত ভঙ্গিটির। দ্বিজেন্দ্রলালের হাতে কাব্যবিষয় যেমন হল ভাবনাময়, কেবল সামাজিক কাহিনীনির্ভর নয়; তেমনি প্রাধান্য পেল ভাবোচ্ছ্বাস। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই ব্যক্তিত্ব উগ্র হয়ে উঠেছে। এই individualistic প্রবলতাই দ্বিজেন্দ্রলালের নিজস্বতা বা স্বাতন্ত্র্য। কখনো ব্যক্তিগত ভাবনাকে তিনি অতিক্রম করে যাননি।

রবীন্দ্রনাথ যেমন অত্যন্ত বাল্যকাল থেকেই দেশমাতার উদ্দেশ্যে বেঁধেছিলেন কিছু দেশাত্মবোধক সঙ্গীত 'একসূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন', 'জ্বল্ জ্বল্ চিতা! দ্বিগুণ দ্বিগুণ' 'অয়ি ভুবনমনমোহিনী', 'আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে' প্রভৃতি। লিখেছিলেন হেমচন্দ্রের অণুকরণে 'হিন্দুমেলার উপহার', 'প্রকৃতির খেদ' নামক জাতীয় ভাবোদ্দীপক কাব্য এবং যেঘ ও রৌদ্র', 'আবদারের আইন', 'ইংরাজের আতংক' প্রভৃতি প্রবন্ধ, দ্বিজেন্দ্রলালও তেমনি বালক বয়স থেকেই দেশের পরাধীনতার বেদনায় রচনা করেছেন দেশ-জননীর বন্দনা-

প্রিয়রঞ্জন সেন তাঁর 'INFLUENCE IN THE MATER & SPIRIT OF LITERATURE'- প্রবন্ধে এই সাধর্ম্যের দিকটি দেখাতে গিয়ে অনুরূপ কথাই বলেছিলেন -

"AN interesting phase of this is seen,
specially in Tagore and also in Dwijendra Lal
who describe the physical features of India
as those of a human being.

ললাটে তোমার নীল নভতল, বিমল আলোকে চির উজ্জ্বল,
নীরব আশিস্ সম হিমাচল, তব বরাভয় কর।

- রবীন্দ্রনাথ।

"On thy brow the blue sky shines.
Ever bright in clear light,
Thy arms the Himalayas, silent blessing,
C asing fear and granting boons".

Or, যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননী ভারতবর্ষ

"When, from the blue sea water thou didst arise,
O India, mother!"[৪]

দ্বিজেন্দ্রলাল ১২ থেকে ১৭ বৎসর বয়সের মধ্যে রচিত আর্য্যগাথা প্রথম ভাগে, যে চারটি ভাগ

রয়েছে - 'প্রকৃতিপূজা', 'ঈশ্বরস্তোত্র', 'বিষাদোচ্ছ্বাস' ও 'আর্য্যবীণা' - তার শেষ দুই অংশে দেশ-প্রেমের কবিতাই সংকলিত আছে। 'বিষাদোচ্ছ্বাস' অংশে স্বাধীন ভারতের তুলনায় পরাধীন ভারতের দুঃখ দুর্দশায় দ্বিজেন্দ্রহৃদয়ে বেদনার প্রকাশই বেশী।

"ওই যায় দিনমণি হ'ল দিবা অবসান।
আসিছেন নিশাদেবী ঢাকিতে বিশ্ব-উদ্যান।"
(সান্ধ্যচিন্তা)

'আর্য্যবীণা'র কবিতাগুলি নবীন কবির সুগভীর জাতি-প্রেমের গূঢ় দ্যোতনাময় আন্তরিকতায় ভরা। এতে বিদ্রূপ বা শ্লেষের নামগন্ধ তো নেই-ই, নেই কোনো মধুর মুরলীধ্বনি। পরবর্তী-কালে ঐতিহাসিক নাটকে দেশপ্রেমমূলক বিখ্যাত সঙ্গীতগুলিতে তিনি যে আদর্শবাদের কথা বলেছেন, এ কবিতাগুলিতে তারই সূচনা। অল্প বয়সেই দ্বিজেন্দ্রলালের প্রত্যয় হয়েছিল যে অধঃপতিত ও পরপদানত কবির পক্ষে প্রেমসঙ্গীত নিতান্ত অসঙ্গত। স্বদেশকে স্বাধীন ও গৌরবান্বিত দেখবার বাসনা ছিল সে বয়সেই।

'স্বদেশ আমার! নাহি করি দরশন।
তোমা সম রম্যভূমি নয়নরঞ্জন।
তোমার হরিত ক্ষেত্র আনন্দে ভাসাও নেত্র,
তটিনীর মধুরিমা তুষিবে এ মন॥'
('স্বদেশস্তোত্র')

কিন্তু তিনি দেখেছেন স্বদেশের মনোমোহন মূরতি অবসিত। বিদেশীর পদতরে আশ্রিতা দেশবাসীর মনে প্রাণে এসেছে অসারতা, নষ্টামি দুষ্টামি, ভণ্ডামি। বিলাপের সুরে তাই তাঁকে বলতে শুনি -

"মলিন হেরিতে মাগো পারি না যে আর।"
('বিষ-ভারতী')

হেমচন্দ্রের 'ভারতবিলাপ', 'ভারতসঙ্গীত', কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের 'সেই ত রয়েছ মা তুমি' রাজকৃষ্ণ রায়ের 'শূন্যকৌটা', আনন্দচন্দ্র মিত্রের 'ভারত শ্মশানমাঝে' প্রভৃতি কবিতায়

ভারতের অতীত গৌরবের জন্য এমন বিলাপের প্রতিধ্বনিই শোনা যায়। দ্বিজেন্দ্রলাল অবশ্য শুধুই বিলাপ করেননি, পরের দেওয়া উজ্জ্বল বেশ পরে যারা নিজেদের বেশ গৌরবান্বিত মনে করছে, মোহভ্রান্ত সেই দেশবাসী ও দেশকে উদ্ধার করার অভিলাষই ছিল তাঁর দেশাত্মবোধক কবিতার মূল সুর।

সেযুগের দেশপ্রেমের একটি লক্ষণ ছিল সুবিরোধ। ঈশ্বরগুপ্তের সময় থেকেই তা দেখেছি। হেমচন্দ্র - যিনি 'ভারতসঙ্গীত'(১৮৬৯), 'ভারতবিলাপ', 'ভারতভিক্ষা'(১৮৭৫) 'বিন্ধ্যগিরি', প্রভৃতি ছোট ছোট কবিতা ও 'বীরবাহু'(১৮৬৪) কাব্যে দেশপ্রেমের উন্মাদনা এবং পতিত ভারতবর্ষের জন্য খেদোক্তি প্রকাশ করেছেন তিনি আবার প্রিন্স অব ওয়েলস বন্দনায় পঞ্চমুখ হয়েছিলেন। 'বন্দেমাতরম' উদ্গাতা বঙ্কিম রবীন্দ্রের মধ্যেও এই বিরোধ ছিল। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন - "স্বাদেশিক ঐক্যের মাহাত্ম্য আমরা ইংরেজের কাছে শিখেছি। জেনেছি এর শক্তি এর গৌরব। দেখেছি এই সম্পর্কে এদের প্রেম, আত্মত্যাগ, জনহিতব্রত। ইংরেজের এই দৃষ্টান্ত আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করেছে, অধিকার করেছে আমাদের সাহিত্যকে।" [৫]

দ্বিজেন্দ্রভাবনায়ও ছিল এ ধরণেরই সুবিরোধ। মাতৃভূমির দুঃখে দুঃখিত হয়েও তিনি বলেছেন -

"মিলিয়া গাওরে বৃটন-মহিমা"

(গাও আর্য্যসূত্রচয়', আর্য্যগাথা - ১ম ভাগ)

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে এই বিরোধ পরিবর্তিত হয়, ফলে পরবর্তীকালে রচিত ঐতিহাসিক নাটকগুলিতে যে স্বদেশী সঙ্গীতের আস্বাদন আমরা পেয়েছি, কোনো বিরোধী ভাবের সংশয়দোলায় তার ঋজুতা নষ্ট হয়নি। বঙ্কিমের 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীতে যে তেজ, যে পৌরুষ আছে দ্বিজেন্দ্রলাল সংস্কৃত ভাষার সাহায্য না নিয়ে বঙ্গভাষার ভিতর দিয়ে সেই তেজ, সেই সজীবতা কিভাবে প্রকাশ করে গেছেন এই স্বদেশীসঙ্গীতগুলিতে তারই পরিচয় পাওয়া যায় -

১। "বঙ্গ আমার! জননী আমার!
ধাত্রি আমার! আমার দেশ,"

২। "যেদিন সুনীল জলধি হইতে
উঠিল জননি! ভারতবর্ষ!"

৩। "ভারত আমার, ভারত আমার,"

৪। "আজি গো তোমার চরণে, জননি!"

৫। "যেবার পাহাড় যেবার পাহাড়"-

৬। "ধনধান্যে পুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা,"

এগুলি দেশপ্রেমের সুষমায় মণ্ডিত। কখনো বাংলাদেশের গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ কখনো বা অখিল ভারতের অধিষ্ঠাত্রী দেবী দ্বিজেন্দ্রলালের দেশমাতা। মধুসূদনের 'বঙ্গভূমির প্রতি'(১৮৬২ জুন, সোমপ্রকাশ), 'ভারতভূমি', সুরমাসুন্দরী ঘোষের 'বঙ্গজননী', অক্ষয়কুমার বড়ালের 'বঙ্গভূমি', প্রমথনাথ রায় চৌধুরীর 'বঙ্গভূমি', 'বাঙালীর মা', নিত্যকৃষ্ণ বসু (১৮৬৫ -১৯০০)র 'বঙ্গলক্ষ্মী', হেমচন্দ্রের 'রাখিবন্ধন', অতুলপ্রসাদ সেনের 'ভারতলক্ষ্মী', সত্যেন্দ্রনাথের 'গাও ভারতের জয়', প্রভৃতি কবিতায় আছে দেশমাতৃকার এমনই বন্দনা। প্রায় সমসাময়িক কবি রজনীকান্ত সেনের কণ্ঠেও উচ্চারিত হয়েছিল কিছু দেশাত্মবোধক সঙ্গীত। কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের 'যায় যেন জীবন চলে', 'স্বদেশের ধূলি', গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর 'ঋণশোধ', 'আদেশবাণী', দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ভারতললনা', বিজয়চন্দ্র মজুমদারের 'আহ্বান', স্বর্ণকুমারী দেবীর 'শতকণ্ঠে করে গান', জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'ওঠ জাগ', 'চলরে চল সবে', অতুলপ্রসাদ সেনের 'বল বল বল সবে', 'হও ধরমেতে ধীর' প্রভৃতি কবিতা, গানও এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে।

তবে পূর্ববর্তী ও সমকালীন এই সমস্ত কবিদের দেশপ্রীতির সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রকবিতার যতই সাধর্ম্য থাকুক না কেন, তাঁর বিশিষ্টতাই আমাদের চোখে পড়ে বেশী। দ্বিজেন্দ্রলালই বাংলা স্বদেশী সঙ্গীতে ইংরেজি গানের সুর ও ছন্দের ঢঙে 'কোরাস' বা বহুকণ্ঠে মিলিত গানের রীতি প্রবর্তিত করেন। যদিও এর আগেই রবীন্দ্রনাথের 'বাল্মীকি-প্রতিভা'(১৮৮১) গীতিনাট্যে ইংরেজি অপেরার অনুসরণে ইংরেজি সুরে ও ঢঙে একাধিক বাঙলা গান আমরা শুনেছি।

বাল্যকালে মধুসূদন যেমন পাশ্চাত্য ভাবকে বাংলা সাহিত্যের অন্তরে প্রবেশ করাতে চেয়েছিলেন, দ্বিজেন্দ্রলালও তেমনি সুগভীর আকর্ষণ অনুভব করতেন পাশ্চাত্য কাব্য ও নাটকের প্রতি। 'হাসির গান' রচনাতে এই পাশ্চাত্যপ্রভাব সুস্পষ্ট। দেশী ও বিলাতী সুরের সংমিশ্রণে তিনি সৃষ্টি করেছিলেন এক অদ্ভুত রস। ভাবের দিক ছেড়ে দিলে দ্বিজেন্দ্রলালের মাতৃভাষাপ্রীতিও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তিনি মনে করেন, মাতৃভাষার সেবার ভেতর দিয়েই দেশমাতার সেবা হয়। তাই বাংলাভাষাই তাঁর জীবনে একান্ত কাম্য। তাঁর সমকালে এবং পূর্বে অনেকেই এই মাতৃভাষার বন্দনা করেছিলেন। ঈশ্বরগুপ্তের 'ভাষা', 'মাতৃভাষা', মধুসূদনের 'বঙ্গভাষা', প্রমথনাথ রায়চৌধুরীর 'বঙ্গভাষা', 'গীতিকা' নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের (১৮৫৩ - ১৯১২) 'সরস্বতী পূজা' মানকুমারী বসুর 'বাণীবন্দনা', অতুলপ্রসাদ সেনের 'বাংলাভাষা' প্রভৃতি কবিতা সেই মাতৃভাষাপ্রেমের উদাহরণ। কিন্তু খাঁটি বাংলা ভাষা বা বাস্তবজীবনের ভাষা দ্বিজেন্দ্রলালই প্রথম তাঁর রচনায় স্থান দেন। তিনি চেয়েছিলেন জাতির কল্যান, সাহিত্যকেও মানবসাধারণের ভিত্তিভূমিতে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করতে, যা সর্বজনহৃদয়বেদ্য, যা সবল সুস্থ চিত্তের পথ্য, যা মনের মোহ সৃষ্টি না করে প্রাণের আশা ও বিশ্বাস সঞ্চার করে তাকেই শ্রেষ্ঠ কাব্য, শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক আদর্শ বলে তাঁর বিশ্বাস ছিল। তাই কেবল মনুষ্যত্বের আদর্শই অংকিত করেননি, সেই আদর্শের কোথায় অসম্পূর্ণতা, কোথায় তা জাতীয়তার বিরোধী সেটা দেখাবার জন্য রচনা করেছিলেন আর এক ধরনের গান। এখানে সরাসরি বাঙালীকে ডেকে বলেননি - 'আবার তোরা মানুষ হ'। ব্যঙ্গের চাবুকে তাদের মধ্যে জাগাতে চেয়েছিলেন মনুষ্যত্ববোধ ও দেশপ্রীতি। উগ্র জাতি-বৈরিতার চাইতে মানবসমাজের সামগ্রিক কল্যাণ ও মৈত্রী স্থাপনে তাঁর আগ্রহ ছিল সর্বাধিক। দেশকালপাত্র নির্বিশেষে সমগ্র ভারতের মঙ্গলেচ্ছাই দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির কবিতা ও গানের বিশেষত্ব। রবীন্দ্রনাথেরও কিছু কিছু হাস্যরসাত্মক রচনা আছে যেমন, 'পঞ্চভূত', 'কৌতুক-হাস্যের যাত্রা' প্রভৃতি; কিন্তু তাঁর কোনো পংক্তি হাতুড়ির মতো আঘাত করে না। এমনকি যদি কখনো বা মর্মস্পর্শী হয় তখনও তাঁর ভাষা নিদারুণ বা কঠিন হয় না, তা কীটসের

'পেলব যামিনী'। আবার যখন গভীরতম বেদনার কথা বলেন তখনও তাঁর স্পর্শে কোমলতাই অনুভূত হয়। কারণ বাস্তবচেতনা রবীন্দ্রনাথের ভাবনায় স্থায়ী হয়নি,) প্রতিভার যথার্থ বাহন সন্ধান করতে গিয়ে প্রথমদিকে তিনি সৃষ্টি করেছিলেন পরীক্ষামূলকভাবে নানা ধরণের সাহিত্য। কিছু কিছু দেশাত্মবোধক কাব্য এবং সঙ্গীতে বাস্তবচেতনার প্রকাশ থাকলেও মূলত: রবীন্দ্রনাথ ছিলেন রোমান্টিক কবি। 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' থেকে তাই তাঁর কাব্য হয়ে ওঠে ভাব-প্রধান, ফলে ভাষায় আসে ব্যঞ্জনাধর্মিতা। বাস্তবজগৎ কবির কল্পনায় হয় রূপান্তরিত - যাকে বলা যায় ভাবগত কবিতা বা গীতিকবিতা। তিনি নিজেই লিখেছিলেন -

> " তখন সেই একটা ঝোঁকের মুখে চলিয়া ছিলাম, মন বুক ফুলাইয়া বলিতেছিল, আমার যাহা ইচ্ছা তাহাই লিখিব - কী লিখিব সে খেয়াল ছিল না, কিন্তু আমিই লিখিব, এই মাত্র তাহার একটা উত্তেজনা।" [৬]

কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল কখনো আবেগের বশবর্তী হয়ে কিছু লেখেননি যদিও জাতীয়তা-বোধের উন্মাদনায় তিনি তাঁর বন্ধুকে লিখেছিলেন -

> " আজ নবজীবনের উন্মাদনায় আমরা আত্মহারা তন্ময় হইয়া গিয়াছি। বাঙ্গালীর জীবনে আজ এ কি অপূর্ব্ব অমৃতের আস্বাদ"! [৫]
>
> (কলিকাতা, ১৯০৪ সনের ৭ই (মাসের নাম অস্পষ্ট, বোধহয়) নভেম্বর)

তবু যা নিজে দেখেছেন বা জীবন দিয়ে উপলব্ধি করেছেন তাই তিনি ভাষায় লিপিবদ্ধ করেছেন। তাঁর ব্যক্তি-মানস সর্বদাই ব্যথাহত জীবনজিজ্ঞাসা ও কঠোর অভিজ্ঞতায় অতৃপ্ত উদ্যত এবং সন্ধানী। কাব্যে সেই ব্যক্তি-জীবনের অভিজ্ঞতার প্রতিফলনই সুস্পষ্ট। উগ্র বাস্তব আর স্বপ্নের আকাংক্ষা দুটোই তাঁর রচনায় আলাদা আলাদাভাবে বিদ্যমান, তাঁর কবিতাকে তাই বলা যেতে পারে বস্তুগত কবিতা বা বস্তুনির্ভর গীতিকবিতা।

বস্তুত: রবীন্দ্রকাব্যজগৎ বাস্তবজগতের চাইতে অনেক বেশী সুন্দর। আমাদের অতিপরিচিত উপেক্ষিত বস্তুগুলিও তাঁর কবিতার রাজ্যে অনুপম সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত হয়। প্রাক্ 'মানসী' পর্বের কাব্যে এই সৌন্দর্যাভিলাষ বিশেষ প্রকট। কারণ তখন তিনি ঘন অন্ধকার,

অস্ফুট ছায়াময় কল্পনারাশি ও ভাবোচ্ছ্বাসমূলক বিষাদের পর্যাপ্ত দীর্ঘশ্বাসের মধ্যে প্রকৃত পথের সন্ধান করছিলেন। রবীন্দ্রনাথ নিজেই 'জীবনস্মৃতি'র একটি প্রবন্ধে সেসময়কার মনোভাব প্রকাশ করেছেন এভাবে -

> "যে যুগে পৃথিবীতে জলস্থলের বিভাগ ভালো করিয়া হয় নাই, তখনকার সেই প্রথম পংকস্তরের উপর বৃহদায়তন অদ্ভুত আকার উদ্ভিদ জন্তু সকল আদিকালের শাখাসম্পদহীন অরণ্যের মধ্যে সঞ্চরণ করিয়া ফিরিত। অপরিণত মনের প্রদোষালোকে আবেগগুলা সেইরূপ পরিণামবহির্ভূত অদ্ভুতমূর্তি ধারণ করিয়া একটা নামহীন পথহীন অন্তহীন অরণ্যের ছায়ায় ঘুরিয়া বেড়াইত।"[৮]

'সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়', 'মহাসৃষ্ণ' (প্রভাতসঙ্গীত, ১৮৮৬), 'নিশীথচেতনা' (ছবি ও গান - ১৮৮৪), 'বন্দী', 'কেন', 'মোহ', 'অক্ষমতা' (কড়ি ও কোমল - ১৮৮৬) প্রভৃতি কবিতার নামই রবীন্দ্রনাথের তখনকার নৈরাশ্য ও বিষাদবিলাসের সাক্ষ্য বহন করে। শুধু রবীন্দ্র-কাব্যই নয়, মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, বিহারীলাল, অক্ষয় বড়াল, কামিনী রায় প্রমুখ সে যুগের প্রায় সব কবির মধ্যে লক্ষ্য করা যায় এই বিষাদ-প্রবণতা। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে মানুষ যেমন পাশ্চাত্য সভ্যতার স্পর্শে নবলব্ধ বিশ্বাস ও নূতন নূতন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের উল্লাসে উজ্জীবিত হয়ে উঠেছিল অন্যদিকে তেমনি দেশীয় অতীত গৌরব হারিয়ে মানসিক হতাশাও দেখা দিয়েছিল। মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র ও কামিনী রায়ের কাব্যে জীবনের ব্যর্থতা এবং তার জন্য জীবন সম্পর্কে অনীহাজনিত এই বিষাদই উপস্থিত। সংসারের অসারতা ও নিষ্ফল আশাই তাঁদের বিষাদের পূর্ণ করেছে। বিহারীলালের কাব্য থেকে এই বিষাদের সুর পাল্টে গেছে। অপ্রাপণীয়ের জন্যে আকুতি ও বেদনা, যাকে আমরা বলতে পারি রোমান্টিক বিষাদ, বিহারী-লালের কাব্যেই প্রথম তা প্রকৃতির মাধ্যমে উচ্চারিত হয়। ইতিপূর্বে রচিত দুটি দীর্ঘ কাহিনীকাব্য 'পতিপ্রেমে দু:খিনী কামিনী' ও 'পিতৃহীন যুবক'-এ অবশ্য নবীনচন্দ্রের রোমান্টিক বিষাদের প্রকাশ ঘটেছে কিন্তু তাতে জীবনের সংযোগ স্থাপিত হয়নি। আবার 'অবকাশরঞ্জিনী'র কয়েকটি কবিতাতেও আছে এই রোমান্টিক বিষাদেরই ব্যর্থ অনুকরণ। বিহারীলালের 'সারদামঙ্গল'-ই এ বিষয়ে প্রথম সার্থক কাব্য। বিশ্বব্যাপিনী

সৌন্দর্যলক্ষ্মীকে একান্তভাবে পাবার গভীর ব্যাকুলতায় তাঁর হৃদয়শতধাবিদীর্ণ।

" হা দেবী, কোথায় তুমি ?
শূন্য গিরি - ফুলভূমি।
কোথায়- কোথায়- হায়- সারদা- সারদা। "

(চতুর্থ সর্গ, সারদামঙ্গল)

দেবী সারদার জন্যে কবির বেদনাময় ক্রন্দনধ্বনি একাব্যের পংক্তিতে পংক্তিতে অনুরণিত।

" কি করিব, কোথা যাব,
কোথা গেলে দেখা পাব,
হৃদি- কমল- বাসিনী কোথারে আমার! "

(প্রথম সর্গ)

" হে সারদে, দাও দেখা।
বাঁচিতে পারিনে একা,
কাতর হয়েছে প্রাণ, কাতর হৃদয়; "

(পঞ্চম সর্গ)

এ সারদা বিশ্বসৌন্দর্যের 'কাল্পনিক বিগ্রহ', যা ধরাছোঁয়ার বাইরে। বিহারীলাল এই অপ্রাপণীয়কে সীমার জগতে অনুভব করবার জন্য ব্যাকুল, আবার রোমান্টিক অপরিতৃপ্তির বেদনায় বিধুর। জগতের কোলাহল থেকে দূরে প্রকৃতির ক্রোড়ে মানসবিশ্রামের আকাংক্ষা তাঁর কবিতার অন্যতর লক্ষণ। রবীন্দ্রনাথের প্রাক্ 'মানসী' পর্বের কাব্যে এই ভাবপ্লাবনই বেশী। প্রকৃতির সঙ্গে অন্তরঙ্গতা আর বিষাদের সুর পাশ্চাত্য রোমান্টিক কবিদের প্রকৃতি ভাবনার বিশেষত্ব। জড় প্রকৃতি জীবন্ত সত্তা হয়ে উঠেছে বিহারীলালে। তাই সারদা প্রকৃতিদেবীও বটে। রবীন্দ্রনাথেও সেই লক্ষণ। শৈশবে প্রকৃতির মধ্যে তিনি আনন্দ অনুভব করেছিলেন। যৌবনের উপভোগের অতৃপ্তিতে তাঁর অন্তরে জেগেছে এক অনির্দেশ্য বেদনা। 'প্রাথমিক স্তরের কাব্যগুলিতে সেই পরিচয়ই পাওয়া যায়।

" কি যেন হারানো ধন কোথাও না পাই খুঁজে,
কি কথা গিয়েছি যেন ভুলে,
বিস্মৃতি স্বপন বেশে পরানের কাছে এসে
আধ স্মৃতি জাগাইয়া তুলে। "

('অতীত ও ভবিষ্যৎ' : শৈশব সঙ্গীত)

'কবিকাহিনী'(১৮৭৮) থেকে 'সন্ধ্যাসঙ্গীত'(১৮৮২) অবধি এই রোমান্টিক বিষাদেরই বাড়াবাড়ি। 'প্রভাতসঙ্গীত'(১৮৮৩)-এ এসে রবীন্দ্রনাথ 'হৃদয়-অরণ্য' থেকে মুক্তি পেলেন। এই মুক্তির ইতিহাস 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ'। তাহলেও বিষাদ থেকে সম্পূর্ণ অতিক্রান্ত হতে পারেননি তিনি। 'ছবি ও গান'(১৮৮৪), 'কড়ি ও কোমল'(১৮৮৬)এ জগৎ ও জীবনকে উপভোগ করবার আকাংক্ষা প্রকাশ পেল। এখানেও রবীন্দ্রনাথ তৃপ্তি পেলেন না। তাই বাস্তবের মোহ ও ভোগের জগতের অতিরিক্ত কিছুর সন্ধানী হলেন তিনি। তাকেও না পেয়ে কবিহৃদয় মথিত করে এক আর্ত ক্রন্দনধ্বনিই উত্থিত হয় -

"বৃথা এ ক্রন্দন।
হায়রে দুরাশা!"

('নিষ্ফলকামনা,' মানসী)

পরিণত পর্বের কাব্যে এই নৈরাশ্যের সুর পরিবর্তিত হয় সুদূরের পিয়াসা ও অসীমের জন্যে তীব্র ক্রন্দনে- "আমি সুদূরের পিয়াসী" (উৎসর্গ, ৮)

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন মূলতঃ বাসনা ও এষণার কবি। অসীম ও অনন্তের জন্য ব্যাকুলতাই তাঁর সার্বভৌম দৃষ্টিকে উদ্বোধিত করেছিল এবং এজন্যই তিনি ক্ষুদ্র খণ্ডের মোহ ত্যাগ করে বিশ্ব-প্রকৃতির মধ্যে নিজেকে সম্প্রসারিত করতে চেয়েছিলেন।

কিন্তু বিহারীলাল ও রবীন্দ্রনাথের এই অপ্রাপণীয়ের জন্য হাহাকার বা রোমান্টিক ব্যাকুলতা আমরা আলোচ্য কবি দ্বিজেন্দ্রলালের রচনায় পাই না। তাঁদের কাব্যের বিষাদমগ্নতা যেন একটি বিলাস। বিষাদের জন্যই বিষাদ, এর কারণও তাঁদের কাছে অজানা, অনির্দিষ্ট,

অস্পষ্ট। কোনো কিছুতেই এঁদের তৃপ্তি আসে না। 'সর্বদাই হু হু করে মন' বা যেন একটি হারাই হারাই ভাব, অর্থাৎ পূর্ণতার মধ্যেও [redacted] অভাব অনুভবই এঁদের কাব্যের বিষাদের মূল সুর। অন্যদিকে দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন স্পষ্টবাদী একরোখা, কাব্যে স্পষ্টতার প্রতি অনুরক্ত, ধোঁয়াটে যা কিছু সবই তাঁর অপছন্দ। এদিক থেকে ফরাসীদের সঙ্গেই তাঁর মিল বেশী - তাঁরাও কাব্যে প্রাঞ্জলতারই মূল্য দিয়ে থাকেন। বাল্যবয়সে রচিত 'আর্য্যগাথা' (১ময় ভাগ)র প্রথমাংশের কবিতাগুলিতে বিহারীলালের অনুরূপ সৌন্দর্যবিভোরতার কিছুটা ছাপ আছে, কেননা এসময় দ্বিজেন্দ্রলাল প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে ধীরে ধীরে বেড়ে উঠছিলেন ফলে চোখের সামনে নক্ষত্র, আকাশ মেঘ, নদী যখন যা দেখতে পেয়েছেন তখন তারই ছবি এঁকেছেন।

নিছক প্রকৃতির স্বরূপ চিত্রণই নয়, প্রকৃতিকে বাৎসল্যময়ী জননীর সঙ্গে তুলনা করে ব্যক্তি-হৃদয়ের মানব ভাবনাকেও করেছিলেন আরোপিত। প্রকৃতির সঙ্গে মানব ও মানব-প্রেমের এই সূক্ষ্ম সম্পর্কের আভাস ইতিপূর্বে আমরা বিহারীলাল ও রবীন্দ্রনাথের রচনাতেই দেখতে পেয়েছি। প্রকৃতি সেখানে হতাশা ও বেদনার সান্ত্বনা-দায়িকারূপেই চিত্রিত। কবিরাও হয়েছেন শেষপর্যন্ত অধ্যাত্মজগতে আশ্রয় সন্ধানী। দ্বিজেন্দ্রলালের প্রকৃতি কবিতায় বিহারীলালের ভাবনিবিষ্টতা ও রবীন্দ্রনাথের অনির্দেশ্য সৌন্দর্যবোধের সন্ধান পাওয়া যায় না। তাঁদের আধ্যাত্মভাবনাও দ্বিজেন্দ্রের প্রকৃতি কবিতায় অনুপস্থিত। অলৌকিক জগতে তাঁর কোনো আস্থা ছিল না। নিসর্গ সৌন্দর্যচিত্রণের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তি-হৃদয়ের বিষাদাত্মক ভাবনাকেও ফুটিয়ে তুলেছিলেন প্রকৃতিচিত্রে।

বলাবাহুল্য প্রকৃতিতে এই মানবত্ব আরোপ প্রবণতা উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় সব কবির কাব্যেই কমবেশী লক্ষ্য করা যায়। মধুসূদনের 'বিজয়া দশমী' সনেটের -

" যেয়োনা, রজনি, আজি লয়ে তারাদলে !
গেলে তুমি, দয়াময়ি, এ পরাণ যাবে !" -

('বিজয়াদশমী', চতুর্দশপদী কবিতাবলী')

নবীনচন্দ্রের 'শশাংকদূত'(অবকাশরঙ্গিনী) কবিতায় -

"কোথা যাও শশধর ! ফিরিয়া দাঁড়াও,
অভাগার গোটা কত কথা শুনে যাও।" প্রভৃতি

('শশাংকদূত', অবকাশরঙ্গিনী ১ম ভাগ)

নির্বিশেষ ভাবসত্তা এঁদের রচনায় হয়েছে রূপারোপিত। ক্ল্যাসিক্যাল বা রূপগ্রাহী ভাবকল্পনার বিশিষ্ট লক্ষণ এটি। নবীনচন্দ্রের সমসাময়িক হরিশচন্দ্র নিয়োগীর (১৮৫৪ - ১৯৩০) রচনাতেও এর উদাহরণ আছে।

"এ অকালে কেন আজি বল গো প্রকৃতিবালা
পরালে এ কুঞ্জ কণ্ঠে এ নব কুসুমমালা।"

('অকালকুসুম', মালতীমালা - ১৮৯৯)

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গীতিকাব্য' বইতে উদ্ধৃত, প.২১০ ।

সেকালের কয়েকজন মহিলা কবির প্রকৃতি কবিতায়ও এই রীতি অনুসৃত হয়েছে। মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায়ের 'গোলাপফুল'(বনপ্রসূন - ১৮৮২), বিরাজমোহিনী দাসীর 'মধ্যাহ্নকালের সূর্য', (কবিতাহার ১৮৭৬), বিনয়কুমারী ধরের 'রাত্রির প্রতি রজনীগন্ধা'(১৮৯৩), সরলাবালা সরকারের (১৮৭৫-১৯৫৮), 'নির্ঝরের আত্মসমর্পণ' (প্রবাহ ১৯০৪), সুণকুমারী দেবীর (১৮৫৭ - ১৯৩২)'কবিতা ও গানে' (১৮৯৬)র শারদজ্যোৎস্নায়' ও 'বসন্তজ্যোৎস্নায়' প্রভৃতি কবিতা প্রকৃষ্ট উদাহরণ। প্রকৃতির সঙ্গে অন্তরঙ্গতায় বাঙালী কবি যে আরো কতদূর অগ্রসর হতে পারে তারও প্রমাণ আছে সে সময়কারই মহিলা কবি গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর কবিতায়। তিনি নিজের হৃদয়বেদনাকে ফুটিয়ে তুলেছিলেন প্রকৃতির বিচিত্র প্রকাশের মাধ্যমে।

প্রায় দ্বিজেন্দ্র সমসাময়িক কবি অক্ষয়কুমার বড়াল ও দেবেন্দ্রনাথ সেন ছিলেন এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য কবি। আধ-আলো-ছায়াময়ী সন্ধ্যা ও রহস্যরূপিনী জ্যোৎস্নানিশীথিনী যেমন ছিল অক্ষয় বড়ালের কল্পনার অনুকূল, দেবেন্দ্রনাথের কল্পনাও তেমনি ছিল চৈত্র বৈশাখের প্রচন্ড রৌদ্রতাপে প্রখর। যে বৈশাখের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ একটি উদাস নির্লিপ্ত রুদ্র

সন্ন্যাসীকে দেখেছিলেন, দেবেন্দ্রবর্ণনায় সেই বৈশাখের রুক্ষ নেত্রপাতে ভয়ার্তা বসন্তের আর্তনাদচিত্র ও সজীব হয়ে উঠেছিল -

"কপালে কংকণ হানি, মুক্ত করি চুল
বাসন্তী যামিনী আহা কাঁদিয়া আকুল।"

('বৈশাখ', শেফালীগুচ্ছ)

অক্ষয়কুমারের প্রকৃতি চেতনায় এই উগ্রতাও নেই, আছে মৃদু শান্ত সমাহিত নিরুচ্ছ্বাস আবেশ। নিশীথিনির সঙ্গে সঙ্গে কোমল সন্ধ্যা ও বর্ষার চিত্রও তাঁর কাব্যে উপস্থিত। এই প্রাকৃতিক চিত্র অংকনে অক্ষয়কুমার ছিলেন রবীন্দ্র-অনুসারী। রবীন্দ্রনাথের মতো তিনিও মানবহৃদয়-প্রীতে আঘাত করে বর্ষার চিরন্তন বিরহের সুরকে জাগিয়ে তুলেছেন। প্রকৃতির অনুভূতির সঙ্গে নিজের অনুভবকে মিশিয়ে এঁকেছেন সন্ধ্যাচিত্র।

প্রকৃতিতে মানবভাবনা আরোপের দিক থেকে দ্বিজেন্দ্রলালের প্রকৃতি-কবিতার সঙ্গে পূর্বে ও সমকালে রচিত এসব কবিতার আপাত সাদৃশ্য থাকলেও তাঁর কবিতার একটি অনন্য-সুলভ স্বাতন্ত্র্য আছে। নিসর্গচিত্র অংকনে এই কবিরা বিহারীলাল ও রবীন্দ্রনাথের আদর্শকেই মূল্য দিয়েছিলেন বেশী। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল কল্পনার রঙে প্রকৃতিকে কখনো রঞ্জিত করেননি। তাঁর কবিতার ভিত্তিভূমি বাস্তবচেতনা, বিষয়নির্ভর প্রত্যক্ষ প্রকৃতির রূপশোভা অংকনই তাঁর এ পর্বের কবিতার লক্ষ্য। কোনো অস্পষ্ট রহস্যবোধে তাঁর দৃষ্টি আচ্ছন্ন নয়। এমনকি যেসব চিত্রের মধ্য দিয়ে অন্তরের বিষাদময় অনুভূতিকে প্রকাশ করেছিলেন তিনি, সেখানেও প্রকৃতির সহজ সরল অনাড়ম্বর প্রকাশই লক্ষ্য হয়। বিহারীলাল রবীন্দ্রনাথের সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা এতে অনুপস্থিত। তাঁর কবিতার ভাষা আগাগোড়াই স্পষ্ট, ঋজু ও বলিষ্ঠ। 'আলেখ্য' কাব্যের ভূমিকায় তিনি নিজেই বলেছেন -

"পদ্যগুলি কবিতা হোক বা না হোক - প্রহেলিকা নয়। প্রত্যেক কবিতা পড়ে' তার মানে দশজন দশরকম বের করে' তাদের নিজেদের মধ্যে বিবাদ করার প্রয়োজন হবে না।"

বলাবাহুল্য পার্থিব বিষয় নিয়ে সব কবিই কবিতা লেখেন তবে সার্থক কবিতার লক্ষণ হল সেই পার্থিবতাকে অতিক্রম করার চেষ্টা বা অপার্থিব, অব্যক্তের আভাস দেওয়া। দ্বিজেন্দ্র-কবিতায় অনেক সময় সেই অব্যক্তের আভাস আমরা পেয়ে থাকি -

" বনে বনে কুসুম ফোটে, ওঠে যখন মলয় বায়।" (গান)

কিংবা -

" তারা ফুলের উপর ঘুমিয়ে পড়ে, ফুলের মধু খেয়ে।" (গান)

এসব পংক্তিতে স্পষ্টতঃ স্বভাবোক্তি অলংকারই উচ্চারিত কিন্তু এর ভেতরে অনুসৃত হয়ে আছে গভীর তাৎপর্য।

আবার দ্বিজেন্দ্রলাল যখন লেখেন -

"আমি প্রভাতের ফুলে, সাঁঝের মেঘেতে,
হেরি তব রূপরাশি,
আমি চাঁদের আলোকে, তারার হাসিতে,
নিরখি তোমার হাসি।"

('কুহু' আর্য্যগাথা - ২য়)

সৌন্দর্যমুগ্ধ কবিচিত্তের বিহ্বলতার কাব্যিক ভাবই ফুটে ওঠে সুসংহত উপমা ও এপ্রিগ্রামে।

প্রকৃতির উদ্দেশ্যে যখন অন্যত্র তাঁকে বলতে শুনি -

"প্রকৃতি অন্তিম দিনে এস দয়া করি।
তাপিত সন্তানে যাতঃ লোয়ো তব ক্রোড়ে ধরি।
শান্তিময় দীপময়,
ধরিওমা ক্লান্ত মম
তরঙ্গ-তাড়িত দেহ ডুবিলে এ ভব-তরি।"

('প্রকৃতি অন্তিম দিনে,' আর্য্যগাথা - ১ম)

তখনও একই ভাব অনুরণিত।

তাবলে দ্বিজেন্দ্রকাব্যকল্পনায়, কখনো রাবীন্দ্রিক অঙ্গবিহীন আলিঙ্গনের অনুভূতির কথা ভাবা যায় না। বসন্ত যে শুধু ফোটা ফুলের মেলা নয়, তার অন্তরালে যে বয়ে যায় ঝরা পাতার রিক্ত-বেদন দ্বিজেন্দ্র-অনুভূতি এত গভীরে অগ্রসর হয়নি। তাইতো রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর অনুগামীদের ন্যায় তিনি বর্ষায় কোনো বিরহের সুর শুনতে পান না। কাঁদা জলের রুক্ষ বাস্তবছবিই ভেসে ওঠে তাঁর বর্ষা চিত্রণে, মাঝে মাঝে অনুভূতির সূক্ষ্মতা ও কল্পনার দীপ্তি রচনাকে মনোরম করে তুললেও। দ্বিজেন্দ্র-কল্পনায় কোথাও বাস্তবতা লঙ্ঘিত হয়নি। মধুসূদন, হেমচন্দ্রের আদর্শে মানবসত্তার আশ্রয়স্থলরূপেই প্রকৃতির সৌন্দর্য চিত্রিত করেছেন তিনি। তবে তাঁর নিজস্বতাও আছে এ বিষয়ে। পূর্বসূরীদের অনুরূপ অন্যচরিত্রের মাধ্যমে নয়, নিজের আনন্দ, ব্যথা ও বেদনাই প্রকৃতিচিত্রণে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাতে স্পষ্টতা ও ঋজুতাই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পূর্বাগত কাব্যমানসেরই নূতন রূপ দ্বিজেন্দ্রলালের এই বস্তুভাবপ্রধান প্রকৃতিকবিতাগুলি।

কাব্যরচনারম্ভকালে সে যুগের বিষাদপ্রবণ বাংলা কবিতার ন্যায় দ্বিজেন্দ্রলালও যে কিছু বিষাদাত্মক কবিতা লিখেছিলেন সেক্ষেত্রে তাঁর বস্তুগত চিন্তাধারাই প্রাধান্য পেয়েছে। বিহারীলাল, রবীন্দ্রনাথের অতৃপ্তি বা পেয়েও হারানোর ভয় তাঁর নেই। বালক বয়স থেকেই তিনি বেদনা অনুভব করতেন দেশের প্রাচীন গৌরবের জন্য দেশবাসীর মনেপ্রাণে অসারতা ও স্বাধীনচিন্তার দীনতায়। এজন্যেই তাঁর মনে হয় শৈশবের দিনগুলিই ছিল সুখময়, এ জীবন যেন জটিলতা ও কুটিলতার ঘন অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে। এখানে প্রতি পদে দুঃখের রাশি। সৌন্দর্যের সাক্ষাৎও পাওয়া দুর্লভ। কবি-মন তাই বিষাদে ভারাক্রান্ত -

" দুখেতে যাপিত মম হল চিরকাল।
নাহি জানিলাম সুখ-হায়রে কপাল।
সন্তরিনু সরোবরে সুখ-সরোজ আশে,
দেখি কমলহীন শৈবাল।"

('নিরাশা,' আর্য্যগাথা - ১ম ভাগ)

ভগ্নহৃদয়ের এই আর্ত হাহাকারই এ পর্বের কবিতায় ধ্বনিত।পূর্বসূরী হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্রের রচনায় এবং প্রায় সম-সাময়িক কবি কামিনী রায় (১৮৬৪-১৯৩৩) ও প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮ - ১৯৪৬)র কবিতায় আমরা এই বিষাদের সুরই শুনতে পাই। প্রমথ চৌধুরী যখন কবিতা লেখেন, যৌবনের উজ্জ্বল দিনগুলি তখন তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়েছে। ফলে প্রৌঢ়ত্বের মোহভঙ্গের হতাশা, যৌবনের আশাভঙ্গের বেদনাই তাঁর কবিতায় আভাসিত। মধুসূদনের হাহাকার বা তাঁর সেই মর্মভেদী আত্মবিচার যদিও এতে নেই তবু বিশ্লেষণপ্রবণ কবিমনের নিরাসক্তি এখানে সহজেই ধরা পড়ে। কামিনী রায়েরও বিষাদের উৎস জীবন ও জগৎ সম্পর্কে আশাভঙ্গজনিত অনীহা।

এছাড়া সেকালের অপ্রধান কবিদের লেখাতেও রয়েছে এই ব্যর্থ আশা বিশ্বাসরিক্ত জীবনের করুণ বিলাপ। দ্বিজেন্দ্রলাল ঠাকুরের 'অন্তিমবাসনা'য় এর উদাহরণ মেলে। প্রিয়নাথ মিত্রের 'হেসো না' কবিতায় আছে জীবনের সুখ অবসানে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রতি বিরাগ। যোগেন্দ্রনাথ সেন জীবনের অনিত্যতায় বেদনাহত।

এই অপ্রধান কবিদের হাতেই জন্ম নিয়েছিল আর একশ্রেণীর বিষাদকবিতা, যার উৎস স্নেহের সম্পর্কের বিরতি বা প্রিয়জনবিচ্ছেদ। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের (১৮৪৫ - ১৮৮৬), 'অকালে বিজয়া'(কবিতামালা), মুন্সী কায়কোবাদের 'নিবেদনে' (অশ্রুমালা ১৮৯৪), গোবিন্দ-দাসের 'আমার চিন্তায় দিবে যঠ'(১৯১১) এ শ্রেণীর কবিতার উদাহরণ। ব্যক্তিগত শোকের চাইতে এখানে সংসারের প্রতি অভিমানই মুখ্য।

কিন্তু এঁদের বেদনার আর্তি আমাদের মর্মে প্রবেশ করে না, তা অগভীর। বিহারী-লালের রোমান্টিক বিষাদের উঁচু সুরের সঙ্গে ব্যক্তিগত জীবনের শোক দুঃখকে বাঁধবার ক্ষমতা এঁদের ছিল না। রবীন্দ্রনাথের 'স্মরণ'(১৯০৩) ও 'শিশু' কাব্যেই প্রথম সে ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। একাব্যগুলি তাঁর পত্নীবিয়োগের (১৩০৭, ৭ই অগ্র:) অব্যবহিত পরেই রচিত। সেজন্য শোকের দুঃসহ আবেগই হয়েছে এ কাব্যগুলির মূল সুর। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিগত শোকদুঃখকে নিজের অন্তরেই আবদ্ধ রাখতেন,শান্ত স্তব্ধ হৃদয়ে সহ্য করতেন, তা নিয়ে

হাহুতাশ করা ছিল তাঁর স্বভাব-বিরুদ্ধ। তাই শোককাব্যেও একান্ত ব্যক্তিরূপটি আমরা দেখতে পাই না। এ কাব্যগুলিতে প্রেমের উদভ্রান্তির যেমন পরিচয় পাওয়া যায় না, তেমনি নেই বিলাপের আর্তক্রন্দন। ব্যক্তিবেদনাকে নৈর্ব্যক্তিক বিশ্বপরিব্যাপ্ত রহস্যব্যঞ্জনায় পরিণতি দানেই তাঁর কবিত্বের চরম প্রকাশ।

ব্যক্তিগত জীবনের এই ব্যথাবেদনা ও বাৎসল্যরসের গভীর অনুভূতি বেশী স্পষ্ট হয়ে উঠেছে দ্বিজেন্দ্রলালের রচনাতে। তাঁর 'আলেখ্য'(১৯০৭) ও 'ত্রিবেণী'(১৯২২) এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য কাব্য। দ্বিজেন্দ্র-হৃদয়ের মর্মবেদনা ও বাৎসল্যরস এতে এক প্রবল অশ্রুবন্যায় স্বতোৎসারিত। বাস্তবসচেতন এই কবি বাস্তবজীবনের সুখদুঃখকে দৈনন্দিন জীবনের সহজ সরল ভাষার মধ্য দিয়ে ফোটাতে চেয়েছেন। তাঁর কবিতায় লক্ষার্থ বা ব্যঙ্গার্থ খুঁজতে হয় না। তিনি কবিতায় কুহেলিকা সৃষ্টি করার বিরোধী ছিলেন। বিশেষতঃ প্রসাদগুণবর্জিত হৃদয়স্পর্শহীন রচনাকে কবিতা বলতেই রাজী নন তিনি। একাব্যে কবির নিজের মুখেই সেই চিত্তগত আদর্শের কথা জানা যায় -

"কাব্যে কবির হৃদয় নেই যার,
তাঁহার কাব্য শব্দসার।"

(সপ্তদশ চিত্র, 'কবি', আলেখ্য)

নিছক বুদ্ধিগত ভাব নয়, Emotional Sentiment - বা ভাবাবেগ সংস্কারই ছিল দ্বিজেন্দ্রকবিতার লক্ষ্য। 'আলেখ্য' ও 'ত্রিবেণী'তে গার্হস্থ্যচিত্র অংকনের মধ্য দিয়ে সেই হৃদয়বেদনার ছবিই সুস্পষ্ট। ইংরেজী কাব্যের প্রসাদে ঊনবিংশ শতাব্দীর কাব্যরসিক বাঙালী যে নূতন ও বিচিত্ররসের আস্বাদ পেয়েছিল, এই গার্হস্থ্যচিত্র তারইএকটি বিশেষ অধ্যায়। দাম্পত্যপ্রেম ও বাৎসল্যরস এই শ্রেণীর কবিতার মূল সুর।

প্রাচীনকাল থেকেই এই বাৎসল্যরসের কবিতার রীতি বাংলা সাহিত্যে চলে আসছে। শিশু কৃষ্ণের জন্য মা যশোদার ব্যাকুলতা ('বৈষ্ণবসাহিত্য') ও পতিগৃহবাসিনী দুর্গার জন্য মেনকার বেদনা (শক্তিসাহিত্য) এই রসেরই বিশেষ অবলম্বন। ঊনবিংশ শতাব্দীর কবিরা

সেই গৃহের শিশু ও জননীকে কেন্দ্র করেই লিখেছিলেন বিভিন্ন ভাবের কবিতা। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বিবিধ কবিতা র অন্তর্গত 'শিশুর হাসি' কবিতায় করেছেন শিশুর স্বর্গীয় হাসির বন্দনা, আবার প্রমথনাথ রায়চৌধুরীর গীতিকা র 'অবোধ ব্যথা' ও গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর অশ্রুকণা (১৮৮৭)র 'ভয়ে ভয়ে' কবিতায় আছে শিশুর অভিমানের ছবি। দেবেন্দ্রনাথ সেন অপূর্ব শিশুমঙ্গল কাব্যের 'শিশুর স্তন্যপান' কবিতায়' স্তন্যপান-রত শিশুর চিত্র অংকনের মধ্য দিয়ে সৃষ্টি করেছেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য। সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার 'সন্ধ্যার প্রদীপ' (১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে 'নলিনী' পত্রিকায় প্রকাশিত) কবিতায় এঁকেছেন সন্ধ্যার প্রদীপালোকে জননী ও শিশুর মহার্ঘচিত্র । গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীও চিত্রিত করে-ছিলেন পুষ্পসুবাসিত জ্যোৎস্না রজনীতে আঙিনায় মায়ের শিশুকে ঘুম পাড়ানোর ছবি।

" মৃদু মৃদু ধীর হাতে, আঘাতি শিশুর মাথে
গায়ে ঘুমপাড়ানিয়া গান। ...
শিয়রেতে জেগে শশী, যেন সে সৌন্দর্যরাশি,
নেহারিছে মগ্ন হয়ে ভাবে।"

(গার্হস্থ্যচিত্র', অশ্রুকণা ,'উনবিংশ শতাব্দীর গীতিকবিতা, সংকলন, পৃ.৪২৩)

এছাড়া মায়ের প্রতি সন্তানের আকর্ষন কত প্রবল তারও পরিচয় আছে বাঙালী কবিদের গার্হস্থ্যচিত্রে। দেবেন্দ্রনাথের 'মা'(অপূর্ব নৈবেদ্য), মানকুমারী বসুর 'মাতৃহারা'(বিভূতি), রজনীকান্ত সেনের 'নবমীর সন্ধ্যা'(আনন্দময়ী), 'ব্যাকুলতা'(অভয়), 'মা'(বাণী) কবিতায় এর উদাহরণ আছে।

দ্বিজেন্দ্রকবিতায় আমরা এ ধরণের ছবি বেশী দেখতে পাই না। জননী ও শিশু তাঁর কবিতাতে নেই, তা নয়। 'নূতনযাত্রা' কবিতাতে রয়েছে এক অপার্থিব সৌন্দর্যেরই বর্ণনা, যেখানে দেখি স্ত্রী মেয়ে কোলে নিয়ে বসে আছে - চাঁদের কিরণ তাদের উপর ছড়িয়ে পড়েছে। তবুও তাঁর গার্হস্থ্যবিষয়ক কবিতা মূলতঃ বেদনার কবিতা। মাতৃহারা পুত্রকন্যার

বিষাদ করুণ মুখশ্রীর ভাবনায় অশ্রুসজল হয়ে উঠেছে। 'আর্য্যগাথা' দ্বিতীয় ভাগ ও 'মন্ত্র' কাব্যে অবশ্য দুএকটি শিশুবিষয়ক কবিতা আছে, যাতে শোকের ছায়া নেই - দাম্পত্যজীবনের সুখস্বাচ্ছন্দময় মুহূর্তে এগুলি রচিত হয়েছিল। তাই শিশুর আশা আকাংক্ষার কাব্যরূপ সৃষ্টি হয়েছে সেখানে।

"শুনলো কারো হবে বিয়ে,
ধরল ধুয়ো অমনি গিয়ে -
"ওমা আমি বিয়ে করব" - কান্নার ওস্তাদ এ।
শোনে কারো হবে ফাঁসি -
অমনি আঁচল ধরল আসি -
" ওমা আমি ফাঁসি যাব" - বিনি অপরাধে"

('কুহু' আর্য্যগাথা - ২য় ভাগ)

রবীন্দ্রনাথের 'কড়ি ও কোমল' (১৮৮৬), 'সোনারতরী'তে কয়েকটি বিচ্ছিন্ন শিশু কবিতা আছে। সেগুলিতে এবং 'শিশু'(১৯০৯) কাব্যের অন্তর্গত কবিতাগুলিতে শিশু-মনস্তত্ত্বের এই অপূর্ব বিশ্লেষণ ও শিশুর আশা আকাংক্ষার এই স্বাভাবিক চিত্রন আছে। তবু রবীন্দ্রনাথের শিশুরা বেশি স্নেহপ্রবণ, তাদের স্রষ্টার মতোই তারা কল্পনাপ্রবণ। বিশ্বের সমস্ত মাধুর্য ও বিশ্বাতীত সৌন্দর্য যেন তাঁর দেহে মনে উথলে উঠেছে। মহিলা কবি কুসুমকুমারী দাসের 'দাদার চিঠি' ও 'খোকার বিড়ালছানা' (১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে 'মুকুল' পত্রিকায় প্রকাশিত) কবিতাদুটি এদেরই সগোত্র।

দ্বিজেন্দ্রলালের শিশুবিষয়ক কবিতায় এই অসীম অনন্তের আভাস নেই। বাৎসল্যরসের সঙ্গে জড়িত হয়েছে জগতের শুভাশুভবোধ। তিনি নবীন আগন্তুককে আহ্বান করেছেন সংসারের নিষ্ঠুর সংগ্রামের একটি বিবর্ণ ছবি এঁকে, ঠিক যেমন মহিলাকবি মানকুমারী বসু 'অভ্যর্থনা' (কাব্যকুসুমাঞ্জলি ১৮৯৩) কবিতায় নবজাতককে অভিনন্দন জানিয়েছেন -

"পথ ভুলে এ ঘর-জগতে
এলি যদি যাদু! আয় আয়!
হৃদয়ের সোহাগ-মমতা
দিব তোরে সহস্রধারায়।"

('অভ্যর্থনা', কাব্যকুসুমাঞ্জলি, 'উনবিংশ শতাব্দীর গীতিকবিতা সংকলন, পৃ.৪২১)

জননীর মৃত্যুতে শিশুর করুণ দৃশ্যও তুলে ধরেছেন দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর গার্হস্থ্যবিষয়ক কবিতায়। অসীম অনন্তের ডাক তাঁর শিশুর কাছে পৌঁছয় না। বাস্তবজীবনে শিশুর স্বাভাবিক আচার আচরণের বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনাই এতে প্রধান। পত্নীবিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে স্নেহময়ী জননী ও পুত্রকন্যাকে নিয়ে মর্ত্যভূমিতে রচিত স্বর্গে যে আকস্মিক বজ্রপাত ঘটে এ কবিতাগুলি তারই পরিচয়বাহী। যে শিশুকে জননী অতি আদর যত্নে ঘুম পাড়ান স্ত্রীর মৃত্যুতে তাকে খেলতে খেলতে ঘাসের উপরেই অসহায়ভাবে ঘুমিয়ে পড়তে দেখে দ্বিজেন্দ্রহৃদয় বেদনায় ভরে ওঠে - এ ছবি আছে 'আলেখ্য'র প্রথম কবিতা 'ঘুমন্তশিশু'তে। মাতৃহারা দুই শিশুপুত্রকন্যাকে একটি পিঁড়ি নিয়ে ঝগড়া করতে দেখে দ্বিজেন্দ্রলাল লিখেছিলেন 'পুত্রকন্যার বিবাদ' কবিতা। কিছু কিছু কবিতায় বাৎসল্য ও দাম্পত্যরস একীভূত হয়ে গেছে। 'হতভাগ্য'তেও এই বেদনা দ্বিগুণ হয়েছে। তিনি বলেছেন তাঁর একটি যাত্রই তরী ছিল তাও ডুবে গেল - একটি ছেলে, একটি মেয়ে নিয়ে এখন কোথায় দাঁড়াবেন। জননীর অভাব তাঁকেই পূরণ করতে হচ্ছে - এ যে কি করুণ অবস্থা তার পরিচয় আছে একাব্যের 'বিপত্নীক' ১ এবং ২-এ। ষোলো বৎসরের বিবাহিত জীবন পর্যালোচনা করেছেন দ্বিজেন্দ্রলাল এখানে।

'ত্রিবেণী' (১৯১২)তে দীর্ঘকাল ব্যবধানে স্মৃতি বিস্মৃতির আলোছায়ায় এক ভাবলোক সৃষ্টি হয়েছে। কবিপ্রিয়া আর গৃহ-পরিজন, পুত্রকন্যার সংসার সীমায় আবদ্ধা নন, তাঁর কাছে হারিয়ে যাওয়া এক সোনার স্বপ্ন। তা সত্ত্বেও এ সব কবিতা পত্নীপ্রেমের স্মৃতিবেদনায় ভারাক্রান্ত -

"যখন যাবে কলরব থামি,
- যখন বড় একা,
কাউকে খুঁজে পাব না আমি
তুমি দিও দেখা।"

(আহ্বান, ত্রিবেণী)

ব্যক্তি-হৃদয়ের বেদনা বিধুরতা একে গীতিধর্মী করা সত্ত্বেও এ কবিতাগুলির ভাব বা ভাষায় নেই সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা বা কল্পনার প্রসার। দ্বিজেন্দ্রের সমগ্র কাব্যরচনায় যে বস্তুভাবপ্রাধান্য এখানেও তাই। প্রসঙ্গতঃ সমকালে রচিত অক্ষয়কুমার বড়ালের গার্হস্থ্যচিত্রমূলক কাব্য 'এষা' (১৯১২)র কথা আমাদের মনে পড়তে পারে। এতেও রয়েছে পত্নীশোকে অধীর কবির নিজের শোচনীয় অবস্থা, বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে পুত্রকন্যা, আত্মীয় পরিজনের দুর্দশার ছবি, দ্বিজেন্দ্র-রচনায় গার্হস্থ্যের তেমন খুঁটিনাটি বর্ণনা না থাকলেও। যাতৃহারা শিশু দুটিকে দেখে তাঁর অন্তরে জাগ্রত বেদনাকেই বেশী মূল্য দিয়েছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল। এছাড়া অক্ষয়কুমার বড়ালের এই শোককাব্যের শেষে পরলোক ও বিশ্ববিধান সম্পর্কে যে তত্ত্বকথার অবতারণা করেছিলেন সেই তত্ত্বদৃষ্টি তাঁর কবিসত্তাকে আচ্ছন্ন করেনি। বরং স্ত্রীর মৃত্যুর কিছুকাল আগে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে তিনি যে কিছুটা সংশয়াচ্ছন্ন ছিলেন স্ত্রীবিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে সেই মেঘ অনেকটাই কেটে গিয়েছিল। মর্মভেদী শোক বা বিষাদই তাঁর এই গার্হস্থ্যচিত্রের মূলভাব।

মহিলাকবি গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, মানকুমারী বসু প্রমুখের রচনায় এই শোকের ছায়াই সুস্পষ্ট। ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি, এঁদের কিছু কিছু কবিতায় আছে জননী ও শিশুর মনোরম ছবি, তবু মূলতঃ এঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন স্বামীবিয়োগবিধুরা। বৈধব্যের যন্ত্রনা এঁদের রচনাকে বিষাদে পূর্ণ করে তুলেছে। কিন্তু এঁদের কবিতা সবক্ষেত্রে গীতিকবিতার উঁচু স্তরে পৌঁছতে পারেনি। সাধারণতঃ শোকজনিত বিষাদ, জীবনের অনিত্যতা ও চঞ্চলতার জন্য খেদই প্রাধান্য পেয়েছে। দু এক ক্ষেত্রে শোকোচ্ছ্বাস ব্যক্তি-সীমাকে উত্তীর্ণ করে গেলেও তা বিশ্বের বেদনায় পৌঁছতে পারেনি।

এই গার্হস্থ্যচিত্রমূলক কবিতার ক্ষেত্রে আরও দুজন কবির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে - এঁরা হলেন দেবেন্দ্রনাথ সেন ও গোবিন্দচন্দ্র দাস। বাঙালীর বাস্তবগৃহ-সংসার ও পত্নীপ্রেমকেই এঁরা এক আবেগমুখ সৌন্দর্যরসে অভিষিক্ত করেছিলেন। যদিও শাশ্বত আবেদনের পরিচয় এখানেও নেই। অতীত স্মৃতির পর্যালোচনায়, মাতৃহারা সন্তানদের বেদনায়, ব্যক্তিগত জীবনের দারিদ্র্য ও নির্যাতন কাহিনী বর্ণনায় ভাওয়ালের কবি গোবিন্দদাস এঁকেছিলেন এক সহজ অনাড়ম্বর শোকগাথা। অন্যদিকে দেবেন্দ্রনাথ রূপ দিয়েছিলেন প্রেমের হাব-ভাব, কটাক্ষ-চাতুরী, লীলাবিলাস ও বিচিত্র প্রসাধনকলা। কেবল দাম্পত্যরস অবলম্বনে এঁদের প্রেমস্বপ্ন বিকশিত। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল এই দাম্পত্যজীবনের অতিরিক্ত প্রেমের যে চিরন্তন রূপ আছে তার প্রতিও আকর্ষণ অনুভব করেছিলেন। পত্নীর মানবীসত্তা প্রতিষ্ঠিত করেছেন এক শাশ্বত প্রেমের পটভূমিকায় - এখানেই দ্বিজেন্দ্রলালের সার্থকতা। কারণ সাহিত্যের মূল লক্ষ্যই হল এই চিরন্তনত্ব।

"কভু ভাবি তোমার আমার
মধ্যে কি শেষ বোঝাপড়া
হয়ে গেছে - তবে:
কিম্বা অন্য কোন জন্মে,
কি অন্য সৌরজগতে,
আবার দেখা হবে।"

(অষ্টাদশ চিত্র, 'বিপত্নীক (২)', আলেখ্য)

তাছাড়া দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন মানুষের প্রতি গভীর বিশ্বাসী। সেজন্য শোকের তীব্র দাবদাহ থেকে সান্ত্বনা পেতে অন্যান্য কবিদের মতো তিনি কোনো পারমার্থিক তত্ত্বকথার অবতারণা যেমন করেননি, তেমনি কোনো স্বর্গ বা দেবতার কাছেও আশ্রয় খোঁজেননি। মানবপ্রেমিক কবি মনে করেন মানুষ নিজেই তার পরহিতব্রত ও মহৎজীবনাদর্শ দিয়ে স্বর্গ রচনা করে। তাইতো কাব্যরচনার শুরুতে দেশমায়ের দুরবস্থা দেখে তাঁর মন যে বিষাদে ভারাক্রান্ত হয়েছিল, যার পরিচয় রয়েছে প্রথম রচনার 'বিষাদোচ্ছ্বাস' অংশের কবিতায়, পরবর্তীতে সেই বিষাদ থেকেও উত্তীর্ণ হতে পেরেছিলেন তিনি। দেশবাসীর আচরণগত অসঙ্গতি বিদ্রূপের ভেতর দিয়ে তাদের মধ্যে দেশপ্রীতি ও মনুষ্যত্ববোধ জাগাবার আকাংক্ষায়।

" দূরত্ব অতীত হবে;
জটিল যাহা সহজ হবে;
দুঃখ হবে দূর;
পরার্থেই ইচ্ছা হবে;
ইচ্ছা হবে ফলবতী,
কার্য্য সুমধুর,"
(ঊনবিংশ চিত্র,'সত্যযুগ,' আলেখ্য)

এই পরার্থ আর কিছু নয়, দেশের ও দেশবাসীর মঙ্গলের জন্য এগিয়ে আসার আহ্বান। বালক বয়স থেকেই কবিমনে এই বাস্তবচেতনা ছিল জাগ্রত। তাই বিহারীলাল ও রবীন্দ্রনাথের মতো অন্তরের বিষাদ অবলম্বনে তিনি কল্পনার জাল বোনেননি - পেয়েও না পাওয়ার বেদনায়। আবার অন্যদিকে হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্রের মতো অতীতের জন্য শুধু আক্ষেপও করেননি, বাস্তবের শুভাশুভবোধও দেখাতে চেয়েছিলেন।

এই বাস্তবরস দ্বিজেন্দ্রলালের প্রেম-বিষয়ক কবিতারও প্রাণকেন্দ্র। বৈষ্ণব কবিদের মতো প্রেমকে অধ্যাত্মসাধনায় রূপান্তরিত করেননি [redacted] বা বিহারীলালের মতো ইন্দ্রিয়-সম্পর্করহিত প্রেমের পূর্বাভাসও দেননি তিনি। পূর্বসূরী বিহারীলালের কবিহৃদয় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল প্রেমের বিচিত্র রূপ বর্ণনায়, যেমন, অনুরাগ ও তার পরিপক্ক স্তর, প্রেমের অবশ্যম্ভাবী ভ্রান্তি, সেজন্য বেদনা ও হতাশা এবং প্রেমের সর্বগ্রাসী সব ভুলানো মোহিনী মায়া - এ সবেই। আবার এখানেই তা থেমে থাকেনি, এ প্রেম বিশ্বনিখিলের সঙ্গে কবিহৃদয়কে যুক্ত করেছে -

" আর কিছু নাই সুখ,
ওই চাঁদ, এই মুখ,
যেন আমি জন্মান্তরে ফিরে দুই পাই,"
('নিশীথসঙ্গীত', শরৎকাল)

বিশ্বনিখিলের সঙ্গে কবিহৃদয়ের এই সুস্পষ্ট যোগ দ্বিজেন্দ্রলালের প্রেমকবিতাতেও অনুভূত হয়। প্রকৃতির ললিতমধুর সৌন্দর্যই তিনি জন্মজন্মান্তরের সুখস্মৃতিপূর্ণ সুস্বছবি দেখতে পেয়েছেন - হৃদয়-রাণীর অভাবে বাইরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তাঁর কাছে অসম্পূর্ণ। এককথায় প্রকৃতির অকৃপণ দাক্ষিণ্যই তাঁর সৌন্দর্যমুখ মানসলোকে এক মধুর সুপ্রসাধ রচনা করেছে।

বিহারীলাল শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে, বাস্তবজগতে প্রেমের কোনো লৌকিক প্রতিষ্ঠাভূমি নেই, অন্তর্জগতেই তার সাক্ষাৎ মেলে। রবীন্দ্ররচনায়ও রয়েছে এই আদর্শায়িত প্রেমের চরম প্রকাশ। 'মানসী'(১৮৯০) 'সোনার তরী' (১৮৯৪) ও 'চিত্রা' (১৮৯৬) ■ কাব্যগ্রন্থ এই পর্যায়েরই। অথচ প্রথমদিকে রচিত তাঁর 'কড়ি ও কোমল'-এর কবিতাগুলি পড়লে মনে হয়, তিনি যেন ইন্দ্রিয়াশ্রিত প্রেমে বিভোর, বাস্তবজগতের প্রেমময়ী মূর্তিই বোধ হয় এখানে উপস্থিত। পৃথিবীর সৌন্দর্য, মানবজীবন একান্তভাবে আলিঙ্গন করে তৃপ্তিলাভের অদম্য পিপাসাই যেন 'কড়ি ও কোমল'-এ ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িত।

বলেন্দ্রনাথের শ্রাবণী কাব্যের 'অন্তরবাসিনী' সনেটে, সুধীন্দ্রনাথের 'দোলা' কাব্যে ও প্রমথনাথ রায় চৌধুরীর (১৮৭২ - ১৯৪১) 'পদ্মা' এবং 'গীতিকা' কাব্যে প্রেমের এই দুর্জ্ঞেয়রহস্যেরই সন্ধান পাওয়া যায়। প্রায় দ্বিজেন্দ্রসমসাময়িক কবি অক্ষয়কুমার বড়াল ও দেবেন্দ্রনাথের প্রেমসাধনাও ছিল আদর্শায়িত প্রেমের সাধনা। যদিও নারীর রূপের আরতি করেছেন দেবেন্দ্রনাথ, তবু বাস্তববোধের চেয়ে আদর্শের ধ্যানলোকেই তাঁদের প্রেম আবিষ্কৃত। বস্তুচেতনার প্রাবল্য তাঁদের ছিল না। অক্ষয়কুমারের 'কনকাঞ্জলি'(১৮৫৮) ও 'এষা'(১৯১২) কাব্যে রয়েছে প্রেমের এই আদর্শায়িত রূপের মহত্তর বন্দনা। লালসা বা উচ্ছৃংখলতা নয়, আছে আত্মবিসর্জন ও সংযম। সংকীর্ণ দেহকেন্দ্রিক ভোগকামনাকে অক্ষয়কুমারের মনে হয়েছে 'পংকিল সরসী'। তাই স্থূল বস্তুকামনার ধূমাংকিত পরিবেশ ত্যাগ করে প্রেমের নির্মল ঊষার আবির্ভাবই তাঁর একান্ত কাম্য। একে কখনো কায়ায় ধরা যায় না, তাইতো শেষ পর্যন্ত প্রেমকে তিনি মৃত্যুরহস্যের সঙ্গে একাত্ম করেছেন -

ভাঙিতে গড়নি প্রেম, ওহে প্রেমময়!
মরণে নাই ত ভিন্ন,
প্রেম-সূত্র নহে ছিন্ন -
সুর্গে মর্ত্যে বেঁধে দেছ সম্বন্ধ অক্ষয়!"
('সান্ত্বনা', ৮, এষা।)

আদর্শায়িত প্রেমকবিতার এটি একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। রবীন্দ্রনাথের 'হৃদয়যমুনা', 'ঝুলন' (সোনারতরী) এবং সুধীন্দ্রনাথের 'ভিখারী' কবিতায় এই লক্ষণেরই প্রাধান্য। দেবেন্দ্রনাথের 'গোলাপগুচ্ছ', এ বিষয়ে একটি উল্লেখযোগ্য কাব্য।

দ্বিজেন্দ্রকাব্যে প্রেমের এই আদর্শায়িত রূপ নেই। রবীন্দ্রনাথ বা বিহারীলালের মতো শেষে এমন কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছননি যে, বাস্তবজগতে প্রেমের আকাংক্ষার ব্যর্থতা অবশ্যম্ভাবী। লৌকিক জগতের 'ইন্দ্রিয়াসক্তি'ই তাঁর প্রেমকবিতার মূল বিষয়। সেকালে রচিত স্বর্ণকুমারী দেবীর 'কবিতাও গান'(১৮৯৫), মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায়ের 'বনপ্রসূন'(১৮৮২), আনন্দ চন্দ্র মিত্রের 'মিত্রকাব্য'(১৮৭৪), কৃষ্ণলাল রায়ের 'মালা'(১৮৯৩), মুন্সী কায়কোবাদের 'অশ্রুমালা'(১৮৯৪), বরদাচরণ মিত্রের 'অবসর'(১৮৯৫) প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে এই ইন্দ্রিয়াশ্রিত প্রেমকবিতার সার্থক সৃষ্টিই আমাদের মনোযোগ আকর্ষন করে। এঁরা প্রেমের বিরহমিলনের সুরে কবিতার সুর বেঁধেছিলেন। প্রেমের সরল আকর্ষণের ব্যাকুলতাই একাব্যগুলিতে ধ্বনিত।

" কে তুমি? কে তুমি ?
ওগো প্রাণময়ী
কে তুমি রমণীমণি !
('কে তুমি' , মুন্সী কায়কোবাদ)
অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গীতিকাব্য' বইতে উদ্ধৃত, পৃ.৬৯ ।

প্রেমিকচিত্তের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার রূপায়ণে হরিশ্চন্দ্র দাসও বিশেষ সাফল্য লাভ করেছিলেন। এঁদেরই সগোত্র ছিলেন গোবিন্দদাস। তিনি হরিশচন্দ্রের ন্যায় প্রধানতঃ প্রেমের কবি নন তবে শোকসঙ্গীত, বিদ্রূপাত্মক কবিতা, সমাজবিষয়ক ও দেশভক্তিমূলক কবিতা প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে

কিছু প্রেমকবিতাও লিখেছিলেন। এগুলির কেন্দ্রভূমিতে আছে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের দুটি বিষয় - বাল্যপ্রেম ও পত্নীপ্রেম।

এই ব্যক্তিগত প্রেমের সাক্ষাৎ পাই আমরা সেকালে রচিত মহিলা কবিদের প্রেম-কবিতায়। তাঁদের কাব্যবিষয় ছিল স্বামীর প্রতি প্রেম অথচ সেখানেও প্রেমের [redacted] আদর্শায়িত রূপের বন্দনাই প্রাধান্য পেয়েছে। অর্থাৎ দয়িতের প্রতি প্রেমিকার নানা আকর্ষণ বিকর্ষণ অবলম্বনে কবিতাগুলি লেখা হলেও ব্যক্তি বা বস্তু তত বড় হয়ে ওঠেনি, ভাবই প্রাধান্য পেয়েছে। দৈহিক উপভোগের উর্ধে যে মিলনের আকর্ষণ, যার প্রতিষ্ঠা কেবল অন্তর্জগতেই সম্ভব, প্রেমের সেই নৈর্ব্যক্তিক রূপটিই এঁদের রচনায় ধরা পড়েছে।

দ্বিজেন্দ্ররচনায় এই নৈর্ব্যক্তিকতার কোনো স্থান নেই। গোবিন্দদাসের মতো পত্নী-প্রেমই তাঁর প্রেমকবিতায় সুলভ। কিন্তু গোবিন্দদাস যেমন দেহপ্রেমের আবেগ ও উচ্ছ্বাসকে অসংকোচে প্রকাশ করেছেন - "আমি তারে ভালবাসি অস্থি-মাংস সহ" দ্বিজেন্দ্রলালের প্রেম-কবিতায় সেই দেহাশ্রয়ী প্রেম নেই বললেই চলে। তাঁর কবিমানসে প্রথম থেকেই একটি রোমান্টিক সৌন্দর্যানুভূতি ছিল। বিবাহ-পরবর্তী জীবনে সুরবালা দেবীর স্পর্শে সেই সৌন্দর্যই প্রেমের নিবিড় উচ্ছ্বাসে ভরে উঠেছিল। এই নিজ দাম্পত্যপ্রেমের ভাবোচ্ছ্বাসপূর্ণ অথচ বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনাই প্রধান তার প্রেমবিষয়ক কবিতায়।

সুরবালা দেবী দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনের আশ্রয় তাই তাঁর মনে হয় জীবনের এই আনন্দচঞ্চল মুহূর্তে যেন কোন বাধা নেই। যুগল হৃদয়ের বিগলিত প্রেমাকাংক্ষা সমুদ্র ও নীল আকাশের বিস্তৃতির মধ্যে নিজেকে মেলে দিতে চায়। বিশেষতঃ ব্যক্তিজীবনের এই প্রেমানুভূতি তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেয় এক চিরন্তন প্রেমপ্রবাহের কথা - তা সত্ত্বেও প্রত্যক্ষের সঙ্গে একটা ব্যবধান থেকেই যায়। রক্তমাংসের মানবী ও বাসনা-ব্যবধান থেকেই যায়। রক্তমাংসের মানবী ও বাসনা-লক্ষ্মী দুজনকে একই হৃদয়াবেগের দ্বারা আরতি করার চেষ্টা করেছেন সত্যি। তবু গৃহিনী সুরবালা দেবীর মানবীসত্তাই কবিদৃষ্টিতে বড় হয়ে উঠেছে।

বস্তুতঃ প্রিয়ার বিরহ কল্পনায় দ্বিজেন্দ্রলাল ব্যথা অনুভব করেন, তাতে জ্বালা বা অতৃপ্তি নেই, প্রেম-পরিতৃপ্ত জীবনে নিজেকে বিলিয়ে দেবার যে সুখ সেই সুখের পিপাসাই তাঁর প্রেমের কবিতার বিশেষত্ব। সেসঙ্গে সমাজ সংসারের বিভিন্ন রূপ এবং সমস্যাও তাঁর কবিতায় নানাভাবে এসে গেছে। মনোজীবন ও কাব্যরীতির এই অদ্বয় সম্পর্কই তাঁর কাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাই তাঁর কাব্যকল্পনা যেমন প্রাণহীন, যান্ত্রিক নয়, তেমনি রোমান্টিক কবিদের মতো অনির্দেশ্য ভাবপ্রধানও নয়; সচেতন মনের স্পষ্ট চিন্তাপ্রবণতা থেকে তা উৎপন্ন। পূর্বসূরীদের বস্তুপ্রাধান্যের সঙ্গে ব্যক্তি-হৃদয়ের আবেগ উচ্ছ্বাস মিশিয়ে কাব্যরচনায় এক নূতন আদর্শের সৃষ্টি করেছেন ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের কবি দ্বিজেন্দ্রলাল।

তৃতীয় অধ্যায়

উল্লেখপঞ্জী

১। 'STUDIES IN WESTERN INFLUENCE ON NINETEENTH CENTURY BENGALI POETRY' (1857-1887) : HARENDRA MOHAN DASGUPTA, PAGE - 174.

২। 'বিবিধ প্রবন্ধ - গীতিকাব্য' : বঙ্কিমরচনাবলী (২য় খন্ড) 'প্রথম প্রকাশ - দোল পূর্ণিমা, ১৩৬১ পৃ.১৮৭।

৩। 'ভূমিকা' : 'ভগ্নহৃদয়' : রবীন্দ্ররচনাবলী : (৫ম খন্ড) : জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ - ২৫শে বৈশাখ ১৩৬৮ : পৃ.১৪

৪। 'INFLUENCE IN THE MATTER & SPIRIT ON LITERATURE' : WESTERN INFLUENCE IN BENGALI LITERATURE : PRIYARANJAN SEN : THIRD EDITION 1966 : PAGE - 260.

৫। 'বাংলা ভাষা পরিচয়' : রবীন্দ্ররচনাবলী (১৪শ খন্ড) : জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ - ২৫শে বৈশাখ, ১৩৬৮ : পৃ.৪৫৫

৬। 'প্রভাতসংগীত' : জীবনস্মৃতি : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : সাধারণ সংস্করণ - জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৭ : পৃ.১২৮।

৭। 'দ্বিজেন্দ্রলাল' : দেবকুমার রায়চৌধুরী : দ্বিতীয় সংস্করণ - আশ্বিন, ১৩৭১ পৃ.৩২৭।

৮। 'ভগ্নহৃদয়' : জীবনস্মৃতি : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : সাধারণ সংস্করণ - জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৭ : পৃ.১০৮

৯। 'ভূমিকা' : আলেখ্য : দ্বিজেন্দ্রলাল রায়